অধ্যায় – ৮ : লোকযান ও গৃহশিল্প

লোকযান

লোকযান লোকায়ত মানুষের যাতায়াতের মাধ্যম। সভ্যতার বিবর্তনে যানের ভূমিকা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যান গতিশীল জীবনের প্রতীক। লোকযান স্থলে জলে যাতায়াতের মাধ্যম। লোকযান লোকপ্রযুক্তি নির্ভর। লোকযান লোকায়ত মানুষের দ্বারা সৃষ্ট ও ব্যবহৃত। লোকায়ত মানুষের নিজস্ব পরিবহনের আধার। লোকযানকে অবলম্বন করে স্থলে-জলে মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করেছে। লোকযান মানুষ বা পশুবাহিত হয়। অতি প্রাচীনকালে পরিবহনের মাধ্যম ছিল মানুষ নিজে। তারপরে পশুই পরিবহনের মাধ্যম হয়ে ওঠে। এরপর চাকার আবিষ্কার মানবসভ্যতার এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পশুদের মধ্যে কুকুর হাতি গোরু মহিষ গাধা ঘোড়া যান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। লোকযানে পশু ও মানুষ কখনো কখনো পরস্পরাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে। মধ্যযুগে লৌকিক জলযান এবং স্থলযান উভয় প্রকার যানই উৎকর্ষের সীমা স্পর্শ করেছে। মানুষ লৌকিক যানের মাধ্যমেই জল এবং দুর্গম ডাঙাকে জয় করেছে। মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বিবাহ এবং মৃত্যু। মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে অন্তিম শ্মশানযাত্রার ক্ষেত্রে যানই মাধ্যম। যাত্রাকালীন অনিশ্চয়তা-বিপদ আপদ লেগেই থাকে। যাত্রাকে কেন্দ্র করে লোকসমাজে শুভাশুভবোধ এবং নানা সংস্কার বিশ্বাস গড়ে উঠেছে। মঙ্গল-অমঙ্গল, গ্রহ-নক্ষত্র-বার-তিথি প্রভৃতি যানকে কেন্দ্র করে সমাজে নানা রীতি-নীতি গড়ে উঠেছে। যানের বাস্তবতা বাংলার লোকগানে, রূপকথায়, মঙ্গলকাব্যে এবং আধুনিক উপন্যাসে প্রতিফলিত। যানকে অবলম্বন করে নানা সম্প্রদায় এবং বৃত্তি গড়ে উঠেছে। মধ্যযুগের লোকায়ত সমাজে যানকে অবলম্বন করে বাংলার সমাজ-অর্থনীতি এবং জীবন যাপনের একটি সুনির্দিষ্ট মানচিত্র অঙ্কন করা যায়। নানা মোটিফ, চিত্রকলা, পুরাণ-প্রবণতা, দেববাদ এবং ধর্মবোধ যানকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। ঐতিহ্য-উত্তরাধিকার এবং অভিজ্ঞতা পুষ্ট লোকশিল্পীরা লোকযানকে নিছক যাতায়াতের মাধ্যম হিসাবে দেখেন নি। লোকযান হয়ে উঠেছে সৌন্দর্যের সারাৎসার। লোকযানের ক্ষেত্রেও প্রয়োজন এবং সৌন্দর্য পরস্পরাশ্রয়ী ভূমিকা পালন করেছে। সমাজগত এবং যুগগত বাস্তবতার অঙ্গীকার লোকযানের ক্ষেত্রে প্রধান শর্তরূপে ধরা পড়েছে। লোকযান

কেন্দ্রিক উৎসব লোকসমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ষোড়শ শতকের বাংলাদেশে প্রচলিত গুরুত্বপূর্ণ লোকযানের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। কবিকঙ্কণের কাব্যে লোকযানের বিস্তৃতি নেই, কিন্তু গভীরতা আছে।

ধর্ম আচ্ছাদিত বাংলাদেশে যাত্রা সম্পর্কিত নানা সংস্কার প্রচলিত ছিল। মঙ্গল-অমঙ্গল, শুভাশুভবোধ এমন সংস্কারের জন্ম দিয়েছিল। যাত্রার সঙ্গে যানের যোগ সুবিদিত। ধর্ম, পুরাণ, দেববাদ, অলৌকিকতা, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, হিন্দুদের স্মৃতি শাস্ত্র, রীতি-নীতি, বিশ্বাস-সংস্কার এবং ধর্মীয় জীবনবোধ বাংলাদেশের লোকযান নির্মাণ এবং যাত্রা সম্পর্কিত নানা বিধিনিষেধের জন্ম দিয়েছে। তা সত্ত্বেও লোকায়ত মানুষের প্রাণশক্তিকে থামানো যায় নি। লোকশিল্পী লোকযান নির্মাণ করেছেন। মধ্যযুগের বাংলাদেশে জলপথে যাতায়াতের জন্য নৌকাই ছিল মাধ্যম। স্থলপথে গোরুর গাড়ি, পালকি, দোলা, ডুলি, রথ এবং পশুবাহিত অন্যান্য যানই ছিল যাতায়াতের উপায়।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লিখিত লোকযানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নৌকা, রথ, পাটের দোলা, চতুর্দোলা প্রভৃতি। নৌকার মধ্যে রয়েছে বাঙালি জাতির শত শত বৎসরের প্রাণসম্পদন। বাঙালির নৌশিল্প উত্তরাধিকার, ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। নৌকায় সাপ, পাখি, হাতি, বাঘ প্রভৃতি প্রাণীর প্রতীক অঙ্কন করা হয়। পাটের দোলা শিবিকা বিশেষ লোকযান। এই লোকযান তৈরির সময় হিন্দুর অদৃষ্টবাদ, শুভাশুভবোধ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পাটের দোলায় পাখি এবং বৃক্ষের প্রতিকৃতি আঁকা হয়। কালকেতু চণ্ডীর কৃপায় অর্থলাভ করে পাটের দোলা কিনেছেন। ধনপতি দত্ত পাটের দোলায় চড়ে নগরে প্রবেশ করেন। মনুষ্যবাহিত এই যান বিবাহ, শ্মশানযাত্রা, রাধাকৃষ্ণের মূর্তি বহন করা, দেবদোল প্রভৃতি প্রয়োজনে ব্যবহার করা হত। চতুর্দোল প্রাচীন লোকযান। চারজন বাহকের বহনীয় যান হল চতুর্দোল। চতুর্দোল নির্মাণ এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে সেকালের সমাজবিধির পরিচয় পাওয়া যায়। চতুর্দোলে শুভাশুভবোধ, যাত্রা-সংস্কার এবং রীতি-নীতিকে মান্যতা দেওয়া হয়। দারুশিল্পীরা তৈরি করেন দোলা। দোলা বহনকারী ব্যক্তিরা হলেন দুলে এবং কাহার সম্প্রদায়ের মানুষ। ছুতোর সম্প্রদায়ের মানুষ দোলা তৈরী করেন। রথ প্রাচীন লোকযান। হিন্দু দেবদেবীর যান হল রথ। পরবর্তীকালে রথ যুদ্ধযান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রামায়ণ-মহাভারতে সেনাপতিদের যুদ্ধের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হল রথ। শ্রেষ্ঠ সূত্রধরেরা রথ তৈরি করেন। শিল্পীরা কাঠ

কেটে রথের ভাস্কর্য তৈরি করেন। রথ আভিজাত্যের প্রতীক। সেকালের অভিজাত মানুষেরা রথে চড়ে যাতায়াত করতেন। কবিকঙ্কণের কাব্যে উল্লিখিত লোকযানের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়া হল -

চতুর্দোল, দোলা, বরদোলা - চতুর্দোল এক প্রাচীন লোকযান। চারজন বাহকের বহনীয় যান হল চতুর্দোল। চতুর্দোলে চারটি দণ্ড, আটটি থাম এবং ছয়টি কলসী থাকে। চতুর্দোলে শুধু প্রয়োজন নয়, তা চমৎকার সৌন্দর্যের স্মারক। শিল্প শুধু বিত্তবান মানুষের সৃষ্টি নয়। শিল্প সমাজ পরিবেশের সঙ্গে একান্তভাবে সম্পৃক্ত। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁর 'প্রাচীন শিল্প পরিচয়' গ্রন্থের ভূমিকাংশে লিখেছেন- "প্রাচীন ভারতের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই অল্পাধিক শিল্প–চর্চা অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাহা প্রতিদিবসের আহার-বিহারের সহিত,[...] উৎসব ও আনন্দ মিলনের সহিত, এবং নিত্যনৈমিত্তিক ধর্মাচরণের সহিত জড়িত হইয়া গিয়াছিল। তাহা গৃহ-প্রাঙ্গণের আলিম্পন-প্রণালীতে বা কামিনীকুন্তলের রচনারীতিতে তুল্যভাবেই অভিব্যক্ত হইত"।[১]

চতুর্দোল নির্মাণ এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে সেকালের সমাজবিধির পরিচয় পাওয়া যায়। চতুর্দোলে শুভাশুভ বোধ, যাত্রা- সংস্কার এবং রীতিনীতিকে মান্যতা দেওয়া হত। গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ তাঁর 'প্রাচীন শিল্প পরিচয়' গ্রন্থের 'চতুর্দোল' প্রবন্ধে লিখেছেন- "উক্ত চতুর্দোল আবার যথাক্রমে জয়, কল্যাণ, বীর ও সিংহ, এই চারি নামে পরিভাষিত, এবং যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বিধ নৃপতিদিগের ভোগ্যা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে"।[২]

মুকুন্দরামের কাব্যে চতুর্দোল এসেছে নিম্নলিখিতভাবে ১)দোলা (পৃঃ৬৭-২বার উল্লিখিত) ২)চৌদুলি(পৃঃ৮৩) ৩)বরদোলা(পৃঃ১০৩) ৪)দোলা(পৃঃ১২৪, ২ বার উল্লিখিত) ৫)দোলা(পৃঃ১২৫, ৬ বার উল্লিখিত) ৬) দোলা(পৃঃ১২৯) ৭) দোলা(পৃঃ২৩১, ২ বার উল্লিখিত) ৮) দোলা(পৃঃ২৫৩) ৯) চৌদল(পৃঃ২৭১) ১০)দোলা(পৃঃ২৯৫) ১১) দোলা(পৃঃ২৯৯) ১২) দোলা(পৃঃ৩০০) ১৩) দোলা(পৃঃ৩০৪) ১৪) দোলা(পৃঃ৬৭) ১৫) দোলা (পৃ: ১৯১)

[উপরিলিখিত লোকশিল্পের পৃষ্ঠা সংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া][৩]

'আখেটিক' খণ্ডে দেখা যাচ্ছে, কালকেতু সম্পদলাভ করে রত্নে ভূষিত দোলা কিনছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"চন্দন তরুর পিড়া লম্বিত মুকুতা চূড়া

কিনে দোলা রত্নে ভূষিত।"[৪]

সেকালে বিবাহ উপলক্ষ্যে দোলার ব্যবহার হতো। খুল্লনার বিবাহে দোলার ব্যবহার এসেছে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –"বিদায় হইয়া বর-কন্যা চাপে দোলা।

"পঞ্চরত্ন হাথে দিল সাধুর মহিলা।"[৫]

দোলা বহনকারী ব্যক্তিদের বলা হয় দুলে। এরা কাহার সম্প্রদায়ের মানুষ। R.V. Russell তাঁর 'The Tribes and Castes of the Central provinces of India, Volume I.' গ্রন্থে লিখেছেন – "Dolia –(Palanquin bearer) A Section of Dhimar [......]Dumar or Dom. – A low Caste of sweepers in Bengal. Sec Kanjar. Subcaste of Basor, Ganda, Panka and Turi. Synonym and subcaste of Mehtar. A Section of Kawar."[৬]

সাধারণ চন্দন কাঠ দিয়ে চতুর্দোলের দণ্ড নির্মিত হত। আর রাজার ব্যবহৃত দোলায় সোনা ব্যবহৃত হত।দোলায় কলসীর অবয়ব সোনা দিয়ে নির্মিত হত। গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ তাঁর 'প্রাচীন শিল্প পরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন - "রাজার চতুর্দোলে কুম্ভ, পদ্মকোষ, এবং পর্বত এই ত্রিবিধ চিহ্ন ব্যবহৃত হইত। সূর্যাদি অষ্টগ্রহের দশাতে জাত নৃপতিদিগের চতুর্দোল যানের অগ্রদেশে যথাক্রমে দর্পণ, অর্ধচন্দ্র, হংস, ময়ূর, শুক, গজ, অশ্ব ও সিংহ, ইহাদিগের প্রতিকৃতি চিহ্ন স্বরূপ নিহিত হইত। ইহাতে নানা প্রকার মণিও খচিত হইত" [৭]

চতুর্দোল লুপ্ত লোকশিল্প। এখন স্মৃতি ভারাতুর বাঙালির স্মৃতির সারণীতে চতুর্দোল উপকথার মত দূরতর কল্পনার বস্তু বলে মনে হয়। শ্রীসত্যকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

তাঁর ‘প্রাচীন বাংলা-কাব্যে কুটিরশিল্প’ প্রবন্ধে লিখেছেন - “দোলা- প্রাচীন বাংলায় মেয়েদের যাতায়াতের জন্য দোলাই প্রধান যান ছিল। আজকাল পল্লি অঞ্চলে এখনও কিছু কিছু দোলার প্রচলন দেখা যায়। বাউরি সম্প্রদায়ের লোকেরাই এই দোলা নির্মাণ – কার্যে সুপটু ছিল। বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বরকন্যার দোলায় গমন ছিল তখনকার দিনের প্রথা। পঞ্জিকায় দেখিতে পাই দুর্গাদেবীও কোনও কোনও বৎসর দোলায় আগমন করেন এবং দোলায় চড়িয়াই চলিয়া যান। কবিকঙ্কণ কালকেতুর বিবাহ – উপলক্ষ্যে এই দোলার উল্লেখ করিয়াছেন –

“গমনের শুভ বেলা বাউরি জোগায় দোলা

তথি বীর কৈলা আরোহণ।” (৮)

পাটের দোলা (কাষ্ঠ ফলকে রচিত দোলা, শিবিকা বিশেষ)

পাটের দোলা হল ‘কাষ্ঠ ফলকে রচিত দোলা’। ‘শিবিকা বিশেষ’ লোকযান হল পাটের দোলা। শিবিকা এক জাতীয় পালকি। ‘প্রাচীন শিল্প পরিচয়’ গ্রন্থে গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ তাঁর ‘শিবিকা’ বিষয়ক প্রবন্ধে বলেছেন - “অতি পূর্বকালে যান প্রভৃতি প্রত্যেক ব্যবহার্য বস্তুতেই জাতিভেদের এবং দেশভেদের চিহ্ন ব্যবহারের আবশ্যকতা বিবেচিত হইয়াছিল। [............] হিন্দুর যাবতীয় বিষয়েই অদৃষ্টবাদ সম্বন্ধ; সুতরাং গ্রহবিশেষের দশাবিশেষে জাত নৃপতিদিগের ভেদসূচক যে চিহ্ন নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের দ্বারা কেবল শুভাদৃষ্ট দুরদৃষ্টেরই সম্ভাবনা বুঝা যায়।” (৯)

সূত্রধর বা ছুতোর সম্প্রদায়ের শিল্পীরা এমন পাটের দোলা তৈরি করতেন। এমন পাটের দোলাতে নানা ছবি আঁকা হত। কখনো পাখির ছবি, কখনো বৃক্ষের ছবি। গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ তাঁর ‘প্রাচীন শিল্প পরিচয়’ গ্রন্থে লিখেছেন –“উহা (শিবিকা বিশেষ, পাটের দোলা) পক্ষীর চিত্রের দ্বারা চিত্রিত, এবং বৃক্ষ- প্রতিকৃতির দ্বারা শোভিত ছিল। অধুনা দৃশ্যমান পাল্কীতেও বৃক্ষ প্রভৃতির চিত্র দেখা যায়।” (১০)

শিবিকায় কাঠের গোত্রবিচার, শুভাশুভবোধ, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা প্রভৃতি নানা সংস্কার-বিশ্বাস মেনে এমন পাটের দোলা প্রস্তুত করা হত।

কবিকঙ্কণের কাব্যের নানা স্থানে পাটের দোলার উল্লেখ আছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পাটের দোলা এসেছে নিম্নলিখিতভাবে –

১) পাটের দোলা (পৃঃ১০৪) ২) পাটের দোলা (পৃঃ১১৩) ৩) পাটের দোলা (পৃঃ১১৪) ৪) পাটের দোলা (পৃঃ১৫৩) ৫) পাটের দোলা (পৃঃ১৮১) ৬) পাটের দোলা (পৃঃ২৪৮) ৭) পাট (কাঠের আসন, শিবিকা, পৃঃ৩০৩, পাটে চড়ি রূপবতী – প্রদক্ষিণ করে পতি, পৃঃ৩০৩) ৮) পাট (কাঠের দোলা,পৃঃ১২৫)

[উপরিলিখিত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া] (১১)

আখেটিক খণ্ডে কালকেতু পাটের দোলা চড়ে নগরে প্রবেশ করেছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"করি শুভক্ষণ বেলা চড়িআ পাটের দোলা
প্রবেশ করয়ে বীর বাসে।" (১২)

আবার বণিক খণ্ডে ধনপতি দত্ত পায়রা ওড়ানোর জন্য পাটের দোলায় চড়ে নগরে প্রবেশ করেছেন –

"করি শুভক্ষণ বেলা চড়িআ পাটের দোলা
কিঙ্কর পঞ্জর লইআ সাথে"।(১৩)

বোঝা যাচ্ছে , অর্থবান মানুষের পাটের দোলা বিশেষ লোকযান রূপে ব্যবহৃত হত।ধনপতি দত্ত পাটের দোলা থেকে নেমে সখাদের সঙ্গে খেলা করছেন –

"ছাড়িআ পাটের দোলা একে একে করে খেলা"। (১৪)

আবার ধনপতি দত্ত পাটের দোলা চড়ে বাড়ি ফিরেছেন – "চড়িআ পাটের দোলা চলে নিজধাম"।(১৫) রামায়ণ প্রসঙ্গেও কবিকঙ্কণ পাটের দোলার উল্লেখ করেছেন –

"করি শুভক্ষণ বেলা চড়িআ পাটের দোলা

সীতা আইল রাম-সম্ভাষণে"।[১৬]

সেকালে রমণীরাও লোকযান রূপে দোলার ব্যবহার করতেন –

"গোধূলি হইল বেলা চাপিয়া চলে দোলা

গলায় নাম্বে বনমালা"।[১৭]

বিবাহ উৎসবে এমন পাটের দোলা ব্যবহৃত হত –

"পাটে চড়ে রূপবতী প্রদক্ষিণ করি পতি

শুভমুখে দুইজনে ছামনী"। [১৮]

কালের নিয়মে পাটের দোলা বিস্মৃতির গর্ভে হারিয়ে গেছে। সাধারণ মানুষ দুবার এরকম মনুষ্যবাহিত যানে চড়ার সুযোগ পেতেন। একবার বিবাহের সময়, আর একবার মৃত্যুর পর শ্মশানে যাওয়ার সময়। অবশ্য অভিজাতদের কাছে দোলায় চড়া স্বাভাবিক বিষয় ছিল। বোঝা যাচ্ছে, মধ্যযুগে লোকযান হিসাবে পাটের দোলা প্রশস্ত ছিল। পাটের দোলা অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পালকি লুপ্ত হয়ে গেছে।খেজুরি প্রভৃতি অঞ্চলে 'পরিযান' নামে এক ধরনের লোকযান বরকনেকে বহন করে নিয়ে যেতো। একালে তাও নেই। আমাদের অতীত স্মৃতি ব্যথিয়ে ওঠে। রাধাকৃষ্ণও পূর্ণিমা তিথিতে দোলায় চড়ে দুলতেন। এই দোলনই দেবদোল। 'স্মৃতিচিন্তামণি:' গ্রন্থে শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন – "পূর্ণিমায়াং গোবিন্দং পূজয়িত্বা দোলয়েৎ। ইদমেব চ দোলনং দেবদোল ইত্যাখ্যায়তে"।[১৯] কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সেই স্মৃতির ধরতা বয়ে এনেছে মাত্র।

নৌকা - মধ্যযুগে বাংলাদেশে যে সমস্ত নৌকা ব্যবহৃত হত, তার দুটি শ্রেণী। একটি শ্রেণী খাল-বিল, নদ-নদী প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হত।এটির সাধারণ নাম হল নৌকা। আর একটি শ্রেণীর নৌকা সমুদ্রে ব্যবহৃত হত,যাকে বলা হত মহানৌকা বা পোত। মহাকবি বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণে 'মহানৌ' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। মহাকবি 'মহানৌ' শব্দটির ব্যবহারে সাহিত্যিক উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন। সীতা উদ্ধারের জন্য হনুমান দক্ষিণ সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছেন। ঝঞ্ঝাতাড়িত মহাসমুদ্রে কোন শাপগ্রস্ত অতিকায়

রাক্ষসী বিশাল শরীর হনুমানকে ভোজনের উদ্দেশে অবরোধ করেছেন। মহাকবি বাল্মীকি লিখেছেন -

"সমাক্ষিপ্তোহস্মি সহসা পঙ্গুকৃতপরাক্রমঃ।

প্রতিলোমেন বাতেন মহানৌরিব সাগরে"।।[২০]

অর্থাৎ - "আমি কোন ব্যক্তি কর্তৃক সাগরে প্রতিকূলবায়ু বেগে সমাকৃষ্ট বৃহৎ নৌকার ন্যায় সহসা হীনতেজা হইলাম"।[২১]

নৌকার মধ্যে রয়েছে বাঙালি জাতির শত শত বৎসরের প্রাণ স্পন্দন। বাঙালির নৌশিল্প উত্তরাধিকার, ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। নৌকা নির্মাণে মূল উপাদান কাঠ। 'যুক্তিকল্পতরু' গ্রন্থে কাঠের জাতি নির্ণয় করা হয়েছে। ভোজের মতে, নৌকায় ক্ষত্রিয় জাতির কাষ্ঠই উপযুক্ত বলে বিবেচিত।

"ক্ষত্রিয় – কাষ্ঠৈর্ঘটিতা ভোজমতে সুখসম্পদ্ নৌকা"।[২২]

নৌকা নির্মাণে নানা নিয়ম রীতি এবং প্রথা প্রাচীন কাল থেকে মেনে চলা হয়। নৌকা শুভ এবং অশুভবোধক হতে পারে। নৌকায় নানা চিহ্ন অঙ্কিত হয়। 'প্রাচীন শিল্প পরিচয়' গ্রন্থে গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ লিখেছেন – "সূর্যাদিগ্রহের দশায় জাত নৃপতিদিগের নৌকার মুখভাগে, যথাক্রমে সিংহ, মহিষ, সর্প, হস্তী, ব্যাঘ্র, পক্ষী, ভেক ও মনুষ্য, ইহাদের মুখাকৃতি বিন্যাসের ব্যবস্থা আছে।" [২৩]

"A Dictionary of Symbols' গ্রন্থে J.E.Cirlot লিখেছেন – "The Origins of animal symbolism are closely linked with totemism and animal worship". [২৪]

ভারতীয় চিত্রকলায় সর্প এবং পাখির প্রতীক বিশেষভাবে অঙ্কিত হয়। নৌকায়ও সর্প পাখির প্রতীক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। Heinrich Zimmer তাঁর Myths and Symbols in Indian Art and Civilization'গ্রন্থে লিখেছেন – "Among the motifs deriving from early Mesopotamian art and Continuing in the

traditions of India to the present day is the pattern of the entwined serpent-pair." (২৫)

কবিকঙ্কণের কাব্যে নৌকার উল্লেখ অনেক। নৌকা নিয়ে একটি পৃথক অধ্যায় রচিত হতে পারে। নিম্নলিখিতভাবে কবির কাব্যে নৌকার উল্লেখ এসেছে –

১) নৌকা(পৃঃ১৭২) ২) ডিঙ্গা(পৃঃ১৯১) ৩) ডিঙ্গা(পৃঃ১৯২) ৪) ডিঙ্গা(পৃঃ১৯২) ৫) ডিঙ্গা(পৃঃ১৯৩) ৬) ডিঙ্গা(পৃঃ১৯৩) ৭) ডিঙ্গা(পৃঃ১৯৫, ৪ বার উল্লিখিত) ৮) তরণী(পৃঃ১৯৭) ৯) ডিঙ্গা(পৃঃ১৯৭) ১০) ডিঙ্গা(পৃঃ১৯৯) ১১) ডিঙ্গা(পৃঃ১৯৯) ১২) ডিঙ্গা(পৃঃ২০০) ১৩) না(নৌকা-পৃঃ২০১) ১৪) ডিঙ্গা(পৃঃ২০১) ১৫) ডিঙ্গা(পৃঃ২০২) ১৬) ডিঙ্গা(পৃঃ২০৩, ৬ বার উল্লিখিত) ১৭) ডিঙ্গা(পৃঃ২০৪, ৬ বার উল্লিখিত) ১৮) ডিঙ্গা(পৃঃ২০৫, ২ বার উল্লিখিত) ১৯) ডিঙ্গা(পৃঃ২১১) ২০) ডিঙ্গা(পৃঃ২১৩) ২১) নৌকা(পৃঃ২২৮) ২২) ডিঙ্গা(পৃঃ২২৮, ৪ বার উল্লিখিত ২৩) ডিঙ্গা(পৃঃ২২৯, ৬ বার উল্লিখিত) ২৪) ডিঙ্গা(পৃঃ২৩০, ৪ বার উল্লিখিত) ২৫) ডিঙ্গা(পৃঃ২৩১) ২৬) ডিঙ্গা(পৃঃ২৩২) ২৭) তরণী(পৃঃ২৩২) ২৮) তরণী (পৃঃ২৩৩) ২৯) ডিঙ্গা(পৃঃ২৩৪) ৩০) নৌকা(পৃঃ২৩৪) ৩১) নৌকা(পৃঃ২৩৫) ৩২) ডিঙ্গা(পৃঃ২৩৬, ২ বার উল্লিখিত) ৩৩) ডিঙ্গা(পৃঃ২৩৯ -২বার উল্লিখিত) ৩৪) ডিঙ্গা(পৃঃ২৪০, ২ বার উল্লিখিত) ৩৫) ডিঙ্গা(পৃঃ২৪৩) ৩৬) ডিঙ্গা(পৃঃ২৪৫, ৯ বার উল্লিখিত) ৩৭) নৌকা(পৃঃ২৪২) ৩৮) ডিঙ্গা(পৃঃ২৪৯, ৩ বার উল্লিখিত) ৩৯) ডিঙ্গা(পৃঃ২৫৫) ৪০) ডিঙ্গা(পৃঃ২৫৭) ৪১) ডিঙ্গা(পৃঃ২৫৮, ২ বার উল্লিখিত) ৪২) নৌকা(পৃঃ২৫৯) ৪৩) ডিঙ্গা(পৃঃ২৬১) ৪৪) ডিঙ্গা(পৃঃ২৯৭, ৪ বার উল্লিখিত) ৪৫) নৌকা(পৃঃ২৯৭) ৪৬) ডিঙ্গা(পৃঃ২৯৮, ৩ বার উল্লিখিত) ৪৭) ডিঙ্গা(পৃঃ২৯৯, ৩ বার উল্লিখিত) ৪৮) নৌকা(পৃঃ৩০১)।

[উপরিউক্ত লোকশিল্পগুলির পৃষ্ঠাসংখ্যা তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া](২৬)

নৌকা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা কবিকঙ্কণের কাব্যে আছে। এছাড়া বিভিন্ন নামের নৌকা যেমন মধুকর, গুয়ারেখি, সিংহমুখী প্রভৃতি নামের নৌকার উল্লেখ কবিকঙ্কণের কাব্যে পাওয়া যায়।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নৌশিল্প এবং মধ্যযুগের বাণিজ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বণিক, বাণিয়া সওদাগর – সাধু নানা নামে প্রশস্ত বণিকবৃত্তি। মনসামঙ্গল কাব্যে যেমন চাঁদবেনে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তেমনি ধনপতি দত্ত। 'দত্ত' উপাধিধারী – জাতিতে কায়স্থ। 'দত্ত কুলে উৎপত্তি নাম ধনপতি'। (২৭) গন্ধবণিক কন্যা খুল্লনা (২৮) সাধু ধনপতি। দক্ষিণ পাটনে (বাণিজ্যের স্থান) চলেছেন বৈশ্যবৃত্তিতে। মধ্যযুগে নৌশিল্পের উৎকর্ষ উচ্চতা ছুঁয়েছিল। বাণিজ্যে শিল্প বিনিময় মধ্যযুগের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নৌকার মাধ্যমেই লোকশিল্প বিনিময়ের সুস্পষ্ট চিত্র এঁকেছেন কবিকঙ্কণ তার কাব্যে। নৌকা প্রাচীন যান। জলপথেই বাণিজ্য বিনিময়, দেশ আবিষ্কার এবং অনুসন্ধানের একমাত্র উপায়স্থল। কবিকঙ্কণ নৌকাকে কাব্যমণ্ডিত করেছেন আশ্চর্য কাব্যভাষায় –

"যৌবনে নারীর মান   উদকে নৌকার যান

নিশাকালে দীপের আদর

জত পর অলঙ্কার   সকল দেহের ভার

যৌবনের পশ্চাতে গৌরব।" (২৯)

ধনপতি সিংহল যাত্রায় যাবেন। দীর্ঘ পরবাস। যাত্রাকালীন শুভাশুভবোধ বিচার করবেন দৈবজ্ঞ। পাঁজি, পুঁথি, রাশিচক্র বিচার করবেন তিনি। সব তিথি বিচার করে গোধূলি সময়ে যাত্রা করবেন। শুভাশুভ তিথি না মেলা সত্ত্বেও ধনপতি বাণিজ্য যাত্রায় গেলেন। ডুবুরি নামিয়ে ডিঙ্গা তুলেছেন ধনপতি। মধুকর, দুর্গাবর, গুয়ারেখি, শঙ্খচূর, মধুপাল, ছোটমুঠি প্রভৃতি নামের ডিঙ্গা তিনি তুলেছেন ডুবুরি দিয়ে। নোঙরে বাঁধা ডিঙ্গা। নৌকায় ভরেছেন চাল। আর নিয়েছেন পাটি(শীতলপাটি) -

"সকল্লাথ পামরী কম্বল পাব বদল করিআ পাটি।" (৩০)

এক প্রজন্ম পরে শ্রীপতি নৌযাত্রা করছেন। সাত নৌকা নির্মাণের প্রস্তুতি নিয়েছেন শ্রীমন্ত। নৌশিল্পী আনিয়েছেন। নৌকার গঠন বর্ণনা করেছেন কবি। দারিদ্র্য জর্জর শিল্পীকুলের পরিচয় দিয়েছেন। পরনে কৌপীনপাত্র, বসনহীন – শন দড়ির ডোর পরিহিত, তেল বর্জিত চুল, গায়ে খড়ি ওঠে, কানে ভাল শুনতে পায় না, ভাল চোখে

দেখতে পায় না, দাঁত নড়ে। বাংলাদেশের নৌশিল্পী এরাই। এই দরিদ্র মানুষেরাই হলেন শিল্পী। তাদের শিল্পসত্তা আছে। বাংলাদেশের নৌশিল্পী এই অপংক্তেয় মানুষ। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"দৈন্য – দুঃখজালে এ জরাকালে

বিফল ডিঙ্গা নির্মাণে।

হাসিয়া উত্তর দিল কারিকর

বসি পুরন্দর-পুরে

জদি দেহ ধন এই তিন জন

পারি ডিঙ্গা গড়িবারে।" [৩১]

ডিঙ্গা নির্মাণের কাজ শুরু হল –

"চারি প্রহর রাতি জ্বালিআ রত্নের বাতি

সাত ডিঙ্গা করএ নির্মাণ।

....

প্রথমে করিল সজ দিঘে ডিঙ্গা শত গজ

আড়ে গজ বিংশতি প্রমাণ

মকর আকার মাথা গজেক অন্তরে বাতা

মাণিকে করিল চক্ষুদান

গড়ে ডিঙ্গা মধুকর মধ্যে জার রইঘর

পাশে গুড়া বসিতে গাবর"। [৩২]

ধনপতির নৌযাত্রার সময়ে খুল্লনা মঙ্গল কামনায় ডাইনি বিদ্যা শিক্ষা লাভ করেছেন। খুল্লনা ডাকিনী দেবতাকে পূজা করেছেন। কাঁউরি কামাক্ষ্যার মন্ত্র নিয়েছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

“তোমার মোহিনী বালা   শিক্ষা করে ডাইন-কলা

নিত্য পূজে ডাকিনী দেবতা”।[৩৩]

প্রাচীন বাংলার গৌরব ছিল জলযান। সেকালের জলযান শুধু প্রয়োজন এবং জীবিকা অর্জনের তাগিদ মেটাতো না। ভারতীয় ঐতিহ্য, উত্তরাধিকার, প্রযুক্তি এবং সৌন্দর্যের দ্যোতক ছিল জলযান। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর “প্রাচীন বাংলার গৌরব” গ্রন্থে লিখেছেন –“বাংলার রাজারা নৌকা লইয়া যুদ্ধ করিতেন। পাল রাজাদের যে যুদ্ধের জন্য অনেক নৌকা থাকিত,সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।”[৩৪]

একালে নৌশিল্প সংকটের মুখে। নৌশিল্পে লোকপ্রযুক্তির ব্যবহার কমে এসেছে। বাঙালির একটি গৌরবের যুগের অবসান ঘোষিত হচ্ছে। প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছে বাংলার একটি প্রাচীন শিল্পকলা। রঙ্গনকান্তি জানা তার “পশ্চিমবঙ্গের লৌকিক জলযান” গ্রন্থে লিখেছেন – “দেশীয় জলযান (নৌকা-দাঁড়, হাল পাল যুক্ত)তৈরির প্রযুক্তি প্রকৌশল, বর্তমানে অবক্ষয়ের মুখে। বলা যায় খুবই সংকটজনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে। [......]সময় মতো সজাগ না হলে একদিকে যেমন পরিবেশ দূষণ ঘটবে অবধারিতভাবে অন্যদিকে আলোচ্য অঞ্চলে এখনও কোনক্রমে টিকে থাকা এই প্রাচীন লোকপ্রযুক্তি ও প্রকৌশলের ধারা জায়গা করে নেবে ইতিহাসের পাতায়, অথবা শিল্পীর আঁকা ছবিতে। কিংবা দ্রষ্টব্য বস্তু হিসাবে জলযান হয়তো জায়গা করে নেবে দেশের সংগ্রহশালায়”[৩৫]

<u>রথ -</u> রথ প্রাচীন লোকযান। হিন্দু দেবদেবীদের যান হল রথ। বেদে রথের উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে রথ যুদ্ধ যান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। রামায়ণ মহাভারতে সেনাপতিদের যুদ্ধের অন্যতম প্রধান মাধ্যম রথ। রথারোহী সেনাপতিরাই শ্রেষ্ঠ রথী ছিলেন।রথে চাকা থাকে। কিন্তু দ্রুতগামী এবং সবল অশ্বচালিত যান হল রথ। পরবর্তীকালে দেবদেবীর মহিমা কেন্দ্রিক উৎসব রথযাত্রার প্রচলন হয়। রথের রশিতে মানুষের হাত পড়ে। রথ কাঠের তৈরি। রথ চালকদের সারথী বলা হয়। প্রাচীনকালে

সারথীরা রথ প্রস্তুত করতেন। একালে সূত্রধর বা ছুতোরেরা রথ তৈরি করেন। নানা দেবদেবীর মূর্তি, রাধাকৃষ্ণের মূর্তি, সপার্ষদ পরিবৃত চৈতন্যদেবের নৃত্য, ভাগবতলীলা প্রভৃতি চিত্র কাঠখোদাই করে শিল্পীরা অঙ্কন করেন। মন্দিরের আকৃতিতে রথ নির্মিত হয়। পাঁচ চূড়া, সাত চূড়া এবং তের চূড়ার রথ প্রসিদ্ধ। পুরীর জগন্নাথ দেবের রথ, মহিষাদলের রথ,মাহেশের রথ যাত্রা বাঙালির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব। রথ কিভাবে ছুতোরেরা সৃষ্টি করেন তার একটি নিপুণ বর্ণনা কবি জসীমউদ্দীন তাঁর 'চৌধুরীদের রথ' কবিতায় লিখেছেন –

"ছুতোর ডেকে রঙিন এ-রথ গড়্‌ল পুলকে
আস্‌ল গাঁয়ের বৃদ্ধ পোটো, রঙিন তুলির সনে,
রেখায় রেখায় বাঁধল সে কোন সোনার স্বপনে"।[৩৬]

আবার 'ধামরাই রথ' কবিতায় কবি লিখেছেন –

"ধামরাই রথ, কোন অতীতের বৃদ্ধ সূত্রধর,
কতকাল ধরে গড়েছিল এরে করি অতি মনোহর।
সূক্ষ্ম হাতের বাটালি ধরিয়া কঠিন কাঠেরে কাটি,
কত পরী আর লতাপাতা ফুল গড়েছিল পরিপাটি।
রথের সামনে যুগল অশ্ব, সেই কতকাল হতে,
ছুটিয়া চলেছে আজিও তাহারা আসে নাই কোন মতে।
তারপর এলো নিপুণ পটুয়া , সূক্ষ্ম তুলির ঘায়,
স্বর্গ হতে কত দেবদেবী আনিয়া রথের গায়;
এই ছবিগুলি রথের কাঠের লিলায়িত রেখা হতে,
কালে কালে তাহা রূপায়িত হতো জীবন দানের ব্রতে"।[৩৭]

কবিকঙ্কণের কাব্যে রথের উল্লেখ এসেছে নিম্নলিখিতভাবে – ১) রথ(পৃ:৮) ২) রথ(পৃ:৯) ৩) রথ(পৃ:৬৮) ৪) রথ(পৃ:৮৮) ৫) রথ(পৃ:১০৩) ৬) রথ(পৃ:১০৩) ৭) রথ(পৃ:১০৮, ৪ বার উল্লিখিত) ৮) রথ(পৃ:১০৯) ৯) রথ(পৃ:১১২) ১০) রথ(পৃ:১৪৪) ১১) রথ(পৃ:১৭৮) ১২) রথ(পৃ:২১১, ২ বার উল্লিখিত) ১৩) রথ(পৃ:২১৮) ১৪) রথ(পৃ:২৪১) ১৫) রথ(পৃ:২৪৩) ১৬) রথ(পৃ:২৪৮) ১৭) রথ(পৃ:২৬৪)।

[উপরিউক্ত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া][(৩৮)]

দেবখণ্ডে উল্লিখিত আছে সূর্যদেব রথে পরিভ্রমণ করেন –

"সুমেরু উপর ভাগে রবি-চন্দ্র রথ লাগে

বেড়িয়া ফিরেন দিবাকর"।[(৩৯)]

রথকে বিবাহের যৌতুক স্বরূপ দেওয়া হত – "দিলেন যৌতুক রথ তুরঙ্গ কুঞ্জরে"।[(৪০)] আখেটিক খণ্ডে কালকেতু চণ্ডীর কৃপায় অর্থলাভ করে শকট বিমান রথ কিনেছেন –

"শকট বিমান রথ কিনে বীর শত শত"।[(৪১)]

কলিঙ্গরাজের মহারথীরা রথে চড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করেন -

'চারি চারু মহাশয় রথে জুড়িআ হয়

মহারথি জায় সারি সারি"[(৪২)]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আখেটিক খণ্ড শেষ হচ্ছে কালকেতু এবং ফুল্লরার রথে চড়ে স্বর্গ গমনের মধ্যে – "বামভিতে রথে বৈসে ফুল্লরা সুন্দরী"।[(৪৩)]

বণিকখণ্ডে সূর্যের রথের রঙের সঙ্গে খুল্লনার রূপের তুলনা করেছেন কবিকঙ্কণ–

"খুলনার রূপে কারে দিব গ তুলনা।

ডাকিআ রবির রথ রাখয়ে খুলনা"।[(৪৪)]

দেবী রথে চড়েই স্থানে স্থানে যাতায়াত করেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"রথ আরোহণে চলে দেবী মাহেশ্বরী

জয়া বিজয়া পদ্মা সঙ্গে সহচরী"।[(৪৫)]

রথ আভিজাত্যের প্রতীক। সেকালে অভিজাত মানুষেরা রথে চড়ে যাতায়াত করতেন। ধনপতি দত্তের পিতৃশ্রাদ্ধে তিনি নানা আত্মীয় কুটুম্বকে নিমন্ত্রণ করেছেন। শঙ্খ দত্ত নামে বণিক আসছেন রথে চড়ে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"সাঁক হৈতে আইল বান্যা নাম শঙ্খ দত্ত

রাতদিন বহে জার অষ্ট-ঘোড়া রথ।"[(৪৬)]

শ্রীমন্তের বিবাহে রাজা তাঁর কন্যা দান করছেন যৌতুক দিয়ে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"রথ তুরঙ্গ দন্তী জৌতুক দিয়া

রাজার দুই কন্যা করাব বিয়া"।[(৪৭)]

দ্রাবিড়ের দেশ-সিংহল দেশ। সে দেশে দেখা যায় সোনার রথে রূপার শিখর –

"কনকরচিত রথ রূপার শিখর।

উড়িছে শতেক হাত নেত মনোহর।"[(৪৮)]

রামায়ণের অনুষঙ্গে কবিকঙ্কণের কাব্যেও রথ ব্যবহৃত হয়েছে –

"রথে হৈতে বীর পড়ে   কদলী যেমন ঝড়ে

শোণিত নিকলে দশমুখে"।[(৪৯)]

যুদ্ধক্ষেত্রে রথের ব্যবহার সেকালে প্রায় অনিবার্য ছিল। বণিকখণ্ডের শেষ অংশে কবিকঙ্কণ লিখেছেন -

"বৈষ্ণবী গরুড়রথে   শঙ্খ চক্র গদা হাতে

আইলা পাশধরা বিঘাতিনী"। [(৫০)]

রথযাত্রা মঙ্গল অনুষ্ঠান। প্রাচীনকালে দেবীপ্রতিমাকে রথে স্থাপন করে পূজা করার বিধি প্রচলিত ছিল। দেবীপুরাণে রথযাত্রার বিধিও নির্দিষ্ট হয়েছিল। কাঠের রথ নির্মাণ করার পরে সোনা,পদ্মরাগমণি এবং হাতির দাঁত দিয়ে রথের অলংকরণ করা হত। চামর, ধ্বজা , পতাকা, দর্পণ দিয়ে রথকে শোভিত করা হত। নানা ফুল, দূর্বা, ধূপ, দীপ সহকারে রথ পুজো করা হয়। দেবীকে রথে বহন করা এবং পুনরায় গৃহে ফিরিয়ে আনা হয়। পুরাণ মতে রথযাত্রা সকলের জন্য। দেবতা,কিন্নর, গন্ধর্ব, পৃথিবীবাসী, পাতালবাসী সকলের জন্য রথযাত্রা নির্দিষ্ট। দেবীপুরাণে বলা হয়েছে –

"রথযাত্রা তদা শক্র সূরৈঃ স্বর্গেঃ সদা কৃতা

তথা কিন্নরগন্ধর্ব্বৈর্ভূপাতালনিবাসিভিঃ।।" [৫১]

ঋগ্বেদ সংহিতায় ইন্দ্রের রথের উল্লেখ আছে। বেদের যুগে রথের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। রথ ঘোড়ায় যোজিত হত। দ্রুতগামী ঘোড়া রশ্মি দিয়ে সংযুক্ত হতো। ঋগ্বেদ সংহিতার ৬মণ্ডলের ৪৪ সূক্তে উল্লিখিত আছে।

"আ ত্বা হরয়ো বৃষণো যুজানা বৃষরথাসো বৃষরশ্ময়োহত্যাঃ।

অস্মত্রাংচো বৃষণো বজ্রবাহো বৃষ্ণে মদায় সুষুজোবহংতু।।" [৫২]

মনুস্মৃতিতে উল্লিখিত আছে চক্রযুক্ত শকটের সাহায্যে সেকালে বাণিজ্য দ্রব্য বহন করা হত। গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত তাঁর 'প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন– "এই যুগে মানুষ, পশু ও চক্রযুক্ত শকটের সাহায্যে বাণিজ্যিক দ্রব্য বাহিত হইত।"[৫২(ক)]

মধ্যযুগের জীবনচর্যাকে অনেকদূর পেছনে ফেলে এসেছি আমরা। মধ্যযুগের সেই বাণিজ্যযাত্রা আর নেই। মধ্যযুগের নৌশিল্প তার গৌরব হারিয়েছে। আর সেই বৈষ্ণবীয় পরিবেশ পরিমণ্ডলে লোকায়ত মানুষের বৃহত্তর উৎসব রথযাত্রায় লেগেছে কালের প্রলেপ। মধ্যযুগের সীমানায় লোকশিল্পগুলি একান্তই লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায়। এক হারিয়ে যাওয়া সময়ের বিষণ্ণ স্মৃতি বাঙালিকে ব্যথিত করে।

গৃহশিল্প

বাঙালির কাছে গৃহ মন্দির স্বরূপ। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত, ভোর থেকে রাত্রির কর্ম, চিন্তা, বিশ্রাম এবং সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ বাঙালির গৃহশিল্পকে কেন্দ্র করে। বাঙালির গৃহকোণ কেন্দ্রিকতা, শুভাশুভবোধ, উৎসব অনুষ্ঠান, বার-ব্রতের সঙ্গে গৃহশিল্পের নিবিড় যোগ। গৃহ পল্লীরমণীর নিজস্ব সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র। বাঙালি রমণীর সংস্কৃতি ভাণ্ডার নানা গৃহস্থালী শিল্প। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে গৃহশিল্প সামগ্রীর প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য চোখে পড়ার মত।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লিখিত গৃহশিল্পগুলির মধ্যে অন্যতম হল - আসন, কাঠা, কাঁথা, কুপি, চিরুনী, ছাতা, পান, পীঠ, কুথ, পামরি (অলংকৃত সূচীকর্ম), পিঁড়া, পিঁড়ি, পিঁজরা, দর্পণ, ভৃঙ্গার (জলপাত্র), সাঁজাকুড়া (সংযুক্ত কুণ্ডের মত আসন), মাজকুড়া (মধ্যশিখর বিশিষ্ট আসন), কমণ্ডলু, করঙ্ক, শয্যা, পাটা (পীঠ বা আসন), ময়ূর পাখার শিল্প, পুটলি-থলি, হাত বাক্স (সাঁপুড়া), টুপি, চুন, পাট (শনের থলে), প্রদীপ, প্রসাধন, শিকা প্রভৃতি।

কাঁথার মধ্যে আছে নারীর শিল্পীমনের যোগাযোগ। হৃদয়ের নিবিড়তর বার্তা শিল্পের মোটিফে ধরা পড়ে। শিকায় শুধু খাদ্যদ্রব্য তুলে রাখা হয় না, তা অলংকৃত সৌন্দর্য। রমণীর আঙুলের অতুলনীয় চমৎকার সূচি-শিল্পের প্রকাশরূপ শিকা। আসন অতিথি অভ্যর্থনায়, মঙ্গল-অনুষ্ঠানে, গৃহস্থের ভোজন সময়ে, আচারে সংস্কারে, পূজা-পার্বণে ব্যবহৃত হয়। বৈদিক যুগেও আসনের ব্যবহার ছিল। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের আসন দান করা হত। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লিখিত গৃহশিল্পের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হল -

আসন-

"অজিনোত্তরসংস্তীর্ণে বরাস্তরণসঞ্চয়ে।

শয়িত্বা পুরুষব্যাঘ্রঃ কথং শেতে মহীতলে।।"৪।।[৫৩]

প্রাচীনকাল থেকেই সভ্য সমাজে আসনের প্রচলন আছে। গৃহকর্মে, মঙ্গল অনুষ্ঠানে, গৃহস্থের ভোজন সময়ে, আচারে- সংস্কারে, পূজা-পার্বণে এবং দৈনন্দিন নানা প্রয়োজনে আসনের ব্যবহার হয়। নানা প্রাকৃতজ উপাদানে আসন তৈরি হয়। পল্লীগ্রামে পাটের আসন, তালপাতা এবং খেঁজুর পাতার আসন লোকশিল্পীরা তৈরি করেন। প্রাচীনকাল থেকে চর্মের আসন হিন্দুদের নানা আচার অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। চর্মের আসন শুদ্ধি হিন্দু আচারের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পূজা-পার্বণে আসনশুদ্ধি হিন্দুর শাস্ত্রীয় অনুশাসনের অংশ। এছাড়া কাঠের আসন এবং স্বর্ণনির্মিত অলংকৃত আসনও সাধারণ গৃহস্থ ও অভিজাত সমাজে ব্যবহৃত হয়।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে আসনের উল্লেখ এসেছে নিম্নলিখিতভাবে – ১) কনক আসন(পৃ:২১) ২) সাঁজাকুড়া(সংযুক্ত কুণ্ডের মত আসন, পৃ:৬৭) ৩) অজিন আসন(পৃ:৮৭) ৪) কনক আসন(পৃ:১৭৪) ৫) আসন(পৃঃ২৮৭, ২ বার উল্লিখিত)

[উপরিউক্ত লোকশিল্পের পৃষ্ঠসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া] (৫৪)

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে গুজরাটে কলিঙ্গরাজের দূত-প্রেরণ অংশে অজিন আসনের উল্লেখ এসেছে। কৃষ্ণসার মৃগচর্ম থেকে নির্মিত আসন হল অজিন আসন। হিন্দু মতে কৃষ্ণসার হরিণের চর্ম স্পৃশ্য।লোকসমাজে ব্যবহার যোগ্য। তা সত্ত্বেও হিন্দু শাস্ত্রে চর্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করার বিধান আছে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"গুজরাটে নিশাচর দিল দরশন

শিবের মণ্ডপে কৈল অজিন আসন।" (৫৫)

দেখা যাচ্ছে, রামায়ণে রামচন্দ্র অজিন আবৃত শয্যাতে শয়ন করতেন। একালে কৃষ্ণসার হরিণ হত্যা নিষিদ্ধ। অজিন আসন একান্তই লুপ্ত লোকশিল্প। সেকালে অভিজাত বিত্তবান মানুষেরা ভৃত্য রাখতেন। ভৃত্য মনিবের আসন এগিয়ে দিতেন। কবি লিখেছেন–

"পরিবারে কোন দাস জোগায় বসন

জোগায় কিঙ্কর কেহ বিচিত্র আসন"। (৫৬)

সেকালের ভৃত্যতন্ত্রের অবসান ঘটে গেছে। বারোমাসিয়ারা (bonded labour) একালে আর নেই। মধ্যযুগের পল্লী পরিবেশের আসন শিল্পীরা একালে গেছে হারিয়ে। কোন ভৃত্যও তার মনিবকে আর আসন এগিয়ে দেবে না।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে স্বস্তিক আসনের উল্লেখ রয়েছে। স্বস্তিক অর্থাৎ শুভকর বা মাঙ্গলিক আসন। দেবখণ্ডে দেবাদিদেব মহেশ্বর ধ্যান করছেন। বসন্তকে সঙ্গে নিয়ে কামনার দেবতা মদন ধ্যান ভঙ্গের জন্য এসেছেন। স্বস্তিক আসনে উপবেশন করছেন মহাদেব। মুকুন্দরাম লিখেছেন –

"ধেআনে আছিল রাউল স্বস্তিক আসনে"।[৫৭]

বৈদিক যুগে যজ্ঞ (দেবতার কাজ), তর্পণ (পিতৃকাজ), অতিথি ও আচার্যের পরিচর্যায়, অনুষ্ঠানে আসনের ব্যবহার ছিল। 'তৈত্তিরীয় উপনিষদে' উল্লিখিত আছে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধার সঙ্গে আসন দান করা হত। আসন দ্বারা তাদের পরিচর্যা এবং সম্মান করে শ্রম লাঘব করা হত। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বৈদিক ঋষির শ্লোকে আসনের প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে –

"যে কে চাস্মৎ শ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং তয়াসনেন, প্রশ্বসিতব্যম্।

শ্রদ্ধয়া দেয়ম। শ্রিয়া দেয়ম। হ্রিয়া দেয়ম। ভিয়া দেয়ম, সংবিদা দেয়ম।" [৫৮]

আসন দান করতে হয় শ্রদ্ধার সঙ্গে। নম্রতার সঙ্গে। সম্ভ্রমের সঙ্গে, বন্ধুভাবে। এমন আসনে নানা চিত্র অঙ্কিত হয়। নানাভাবে প্রতীকায়িত করা হয় আসনকে। অজিত মুখার্জী তাঁর "Folk art of India' গ্রন্থে লিখেছেন – 'India's folk arts and crafts can fully be appreciated from the significance they derive from their perennial vitality. Symbolic of the universal urge, the heritage springs from the deepest sources of the inner life". [৫৯]

<u>কড়ি-</u> প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে কড়ি দানের উল্লেখ আছে। প্রায়শ্চিত্তে কড়ি দান করা হত। হিন্দুশাস্ত্রে বলা হয়েছে-

“যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণকৈকপ্রাজাপত্যপাদানুকল্পৈকপয়স্বিধেনুপাদমূল্যদ্বাদশকার্যাপণাদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদুষাং পরামর্শঃ।” (৬০) সংস্কৃত ‘কপর্দক’ শব্দ থেকে কড়ি শব্দের উৎপত্তি। প্রাচীন মুদ্রামানের সর্বশেষ স্তর হল কড়ি। শুধু বাংলাদেশ নয়, কয়েক শতাব্দী জুড়ে গোটা ভারতেই কড়ি কেনাবেচার মাধ্যম ছিল। প্রাচীনকাল থেকে বাঙালি সংস্কৃতি এবং লোকজীবনে কড়ি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে এসেছে। বিশেষত বাঙালির সংস্কারে , বিশ্বাসে, লোকক্রীড়াতে-লোকশিল্পে – গল্পে – গাথা এবং রূপকথাতে কড়ি অচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত ছিল। সেকালে অনেক রমণীর সন্তান বাঁচত না, তখন সন্তান জন্মানো মাত্রই অন্য কোন রমণীর কাছে কড়ির বিনিময়ে আপন সন্তানকে মা বিক্রি করে দিতেন। কড়ি দিয়ে কেনা সংখ্যা অনুযায়ী সন্তানের নাম চিহ্নিত হত। সংস্কার ছিল বিজোড় সংখ্যার কড়ি দিয়ে সন্তান কেনার। হিন্দু বিবাহে মাঙ্গলিক বিভিন্ন উপকরণের সঙ্গে কড়ি রাখা হত। লক্ষ্মীর সিংহাসনে রাখা হত কড়ি। সেকালে অনেক বনেদি পরিবারে বিবাহের পরে বর বধূ কড়ি খেলা খেলেন। কিছুকাল আগেও শিশুদের ঘুনসীতে কড়ি বাঁধা থাকত। আর কড়িকে নানাভাবে অলংকৃত করা হত।কড়ি এবং ঝিনুক দিয়ে ঘরের দেওয়াল এবং ঘরের অলংকরণ চমৎকার শিল্প সৌন্দর্যের নিদর্শন। সেকালে পাখা, কুলো, হুঁকো, ঝাড়বাতি, পানের কৌটো, ঝাঁপি, বেড়ানোর ছড়ি প্রভৃতিতে কড়ি দিয়ে যে শিল্প সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হত, তা বিস্ময়কর। এককথায়, কড়ি বাঙালি সংস্কৃতির এক ইতিহাস। ছড়ায়, ধাঁধায়, প্রবাদে, সাহিত্যে, শিল্পে এবং নামকরণে কড়ি প্রাচীন মধ্যযুগের বাঙালি সংস্কৃতির অনেকখানি অংশ ছিল। প্রবালকান্তি হাজরা তাঁর ‘গ্রামীণ জীবনরাগের ঝিলিক’ গ্রন্থে লিখেছেন – “বর্ণভেদে স্বর্ণকড়ির নাম সিংহী, ধূম্র বর্ণের নাম ব্যাঘ্রী, ওপরে হলুদ – নিচে সাদার নাম মৃগী, সাদা কড়ির নাম হংসী, আর ছোট কড়ির নাম বিদন্তা। কড়ি কমবেশি সকলেরই দেখা – এটি নারী যৌন অঙ্গের সদৃশ”। (৬১)ভারতবর্ষ এবং চীন দেশে প্রাচীনকাল থেকে কড়ির ব্যবহার চলে আসছে। ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ গ্রন্থে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন – “শুক্লযজুর্ব্বেদে ইহার উল্লেখ আছে।ভাস্করাচার্য্য লীলাবতীতে ইহার মূল্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রে ব্যবস্থায় পণ কার্যাপণ ইত্যাদি কড়ীর পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাঙ্‌লা হিসাবে পয়সার অঙ্ক ‘৫’ পাঁচগণ্ডা কড়ীর (এক পয়সার) সংখ্যাসূচক।” (৬২)

কড়ি শঙ্খের মত ছোট সামুদ্রিক প্রাণীর অস্থিকোষ। মধ্যযুগে কড়ির বিনিময়ে দ্রব্য কেনাবেচা হত। সামুদ্রিক প্রাণীকে সমুদ্র থেকে তুলে শিল্পীরা পরিষ্কৃত করে কড়ির আকার দিতেন। কড়ি অর্থে ধন, মুদ্রা, টাকা পয়সা বোঝায়। কড়ির আকারে সেকালে সোনার অলংকারও ব্যবহার করা হত। এমন কড়িকে বলা হয় 'মদন কড়ি'। মধ্যযুগে কানের অলংকাররূপে কড়ি ব্যবহৃত হত। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কড়ির উল্লেখ অনেকবার এসেছে।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কড়ি টাকা পয়সা অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে– ১) কড়ির থলি(পৃ:৬৬) ২) কড়ি(পৃ:৮৩) ৩) কড়ি(পৃ:৮৪) ৪) কড়ি(পৃ:৮৯) ৫) রঙ্গন কড়ি(পৃ:১২১) ৬) কড়ি(পৃ:১২৫) ৭) কড়ি(পৃ:২৮৪, ২ বার উল্লিখিত) ৮) কড়ি (পৃ:৩০৪)

[উপরিউক্ত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যপঞ্জীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া] (৬৩)

মুকুন্দরামের কাব্যে গুজরাট নগরে প্রজাবসতির উল্লেখ আছে। কবি লিখেছেন –

"কেওরা বসিল হাড়ি ঘাস কাট্যা লয় কড়ি

সুঁড়ির ঘরেতে জার মেলা।" (৬৪)

ভাঁড়ু দত্ত হাটে নানা দ্রব্য সংগ্রহ করছেন। কিন্তু কেনা কাটার পর তিনি দোকানদারকে পয়সা দিতে চাইছেন না। কবি লিখেছেন –

'পসার লুটিআ ভাঁড়ু ভরয়ে চুপড়ি

জত দ্রব্য লয় ভাঁড়ু নাঞি দেয় কড়ি।।' (৬৫)

কবিকঙ্কণের কাব্যে শুধু কড়ি নয়, কড়ির থলির উল্লেখ আছে। কড়ির থলি ঠাকুরমা দিদিমাদের সেই একটা বিশেষ হারিয়ে যাওয়া কালকে স্মরণ করায়। বাঙালি জীবনে ঠাকুরমার দান অশেষ। শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায় 'বাঙালি জীবনে ঠাকুরমার দান' প্রবন্ধে সেকালের আশ্চর্য মোটিফ চিত্র সম্বলিত ঠাকুরমার থলের পরিচয় দিয়েছেন।লেখক লিখেছেন – "তারা (পাঁচ – ছয় বছর বয়সের শিশুরা) এই সময়ে নানারূপ অদ্ভুত, রোমাঞ্চপূর্ণ পরির গল্প রাক্ষসের গল্প শুনতে অত্যন্ত ভালবাসে। আজ বাংলাদেশে যে ঠাকুমার ঝুলি, ঠাকুমার গল্প, ঠাকুমার থলে – কত আবিষ্কার হয়েছে,

কেউ যেমন মনে না করেন যে, এ গল্পগুলি ঢাকঢোল নিয়ে প্রকাশ্য স্থানে যাত্রাগান ইত্যাদির অনুরূপ করা হয়। ঘরের কোণে বসে মালা জপতে জপতে ঠাকুমা এই সব শিশুদের নিয়ে গল্পগুলি করে থাকেন। ” (৬৬)

ঠাকুমার বা ঠানদিদির থলেতে কত কি থাকত। সেকালের ঠাকুরমার ঝুলিতে এমন কড়িও থাকত। ঠাকুরমা ছাড়া অন্যরাও কড়ির থলি ব্যবহার করত। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

“মনে বড় কুতুহলি   কান্দে কড়ির থলি

হড়পি তরাজু করি হাথে”।(৬৭)

কড়ি বাঙালি জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। কড়ি লুপ্ত লোকশিল্প। কড়ি বিত্ত ও অর্থের প্রতীক। একালে কড়িকে গ্রামীণ মেলা এবং সাহিত্যের পাতাতে ছাড়া আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কড়ির এমন যুগ সময়ের সাথে সাথে লুপ্ত হয়ে গেল।

কাঠা- চাল ধান মাপার বিশেষ পাত্র হল কাঠা। কাঠা সাধারণত বেতের তৈরি। কাঠায় চাল মাপার যে হিসেব তা হল ‘পাঁচ – সেরী পাত্র’। ডোম সম্প্রদায়ের শিল্পীরা বেত দিয়ে কাঠা তৈরি করেন। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কাঠার উল্লেখ আছে। সেকালে দ্রব্য বিনিময়ের মাপক বস্তু ছিল কাঠা। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে কাঠার উল্লেখ আছে –

“এক কাঠা কায়ন যে মাপিয়া থুইল।

এক কাঠা মুক্তা তার বদলে লইল।।” (৬৮)

কবিকঙ্কণের কাব্যে ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচার প্রসঙ্গে কবি কাঠার উল্লেখ করেছেন –

“মাপে কোণে দিয়া দড়া   পনর কাঠায় কুড়া

নাঞি মানে প্রজার গোহারি।” (৬৯)

নিত্য অনটনের সংসার ফুল্লরার। সময়ে সময়ে মাংস বিক্রি হয় না। বাসি মাংস কেউ কেনে না। অভাবী ফুল্লরা সখীর বাড়িতে গেছেন দু'কাঠা চাল ধার করতে। সখী তাকে বিমুখ করেন নি –

"ফুল্লরা দুকাঠা চালু মাগিল উধার।

কালি দিহ বল্যা সই কৈল অঙ্গিকার।।" (৭০)

একালে আর কাঠার ব্যবহার প্রায় নেই। কাঠা হারিয়ে গেছে। কাঠা চালের মাপক বস্তু হিসাবে আর ব্যবহৃত হয় না। চাল, ধান, খুদ প্রভৃতি ফসলের মাপক বস্তুরূপে বেত শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য। বাণী দাস তাঁর 'বেতশিল্প' প্রবন্ধে বলেছেন – "বেতশিল্পের উৎপত্তি সম্পূর্ণতই লোকশিল্প হিসাবে। আর লোকশিল্পের উৎপত্তি প্রাথমিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য। কৃষিজীবী সমাজের প্রয়োজনটা প্রত্যক্ষ কৃষি সংক্রান্ত। ধানচাল ইত্যাদি রাখার জন্য বা মাপার জন্য বেতের তৈরি জিনিস ব্যবহার করা হয়। তারপর পরোক্ষত আরও বিভিন্ন রকম প্রয়োজনে বেতের তৈরি জিনিস ব্যবহার করা হয়। [..........] এখন এ প্রয়োজনটি একেবারেই লুপ্ত।" (৭১)

সেকালের শিল্পীরা তাদের ব্যবহারিক সৃষ্টিকর্মে নিয়ে এসেছেন শৌখিনতা, সূক্ষ্মতা ও শিল্পসুন্দর রূপ। তেমনি শিল্পের মধ্যেই এমন তুচ্ছ বেত নির্মিত দ্রব্য 'কাঠা' বেঁচে আছে। Jane Ellen Harrison তাঁর "Ancient Art and Ritual" গ্রন্থে লিখেছেন – "Art is long , and time is fleeting". (৭২)

কাঁথা- সেকালের বঙ্গ রমণীদের নিজস্ব কলাশিল্প ছিল কাঁথা। সেকালের বঙ্গ রমণীরা কাঁথায় রামায়ণ এবং ভাগবতের চিত্র অঙ্কন করতেন। রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা, চৈতন্যদেব, রাসমণ্ডল এবং নগর কীর্তনের চিত্র কাঁথায় অঙ্কন করতেন। 'বঙ্গের অন্তঃপুরশিল্প' প্রবন্ধে শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন – "এই শিল্প পশ্চিমবঙ্গে নাই বলিলেই হয়। [........] যাঁহারা ওই প্রকার কাঁথা প্রস্তুত করিতেন, তাঁহাদের সৌন্দর্যবোধ যে কিরূপ প্রবল ছিল, বর্ণবিন্যাসে তাঁহাদের যে কতদূর দক্ষতা ছিল, তাহা চিন্তা করিলে গর্বে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে। অথচ যে সকল রমণী ওই সকল কন্থা প্রস্তুত করিতেন, তাঁহারা নিরক্ষর ছিলেন, কেহই কোনও বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন নাই।"(৭৩)

গুজরাট নগর পত্তনের সময় নানা সম্প্রদায়ের মানুষ গুজরাটে এসেছেন। শিল্পীরা যেমন এসেছেন, তেমনি এসেছেন সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"কাঁথা কমণ্ডলু লাঠি গলায় তুলসী – কাঁঠি

সদাই গোঙায় গীত নাটে"।[৭৪]

বৈষ্ণবের গায়ে নানা তীর্থচিহ্ন,হরিনাম করেন, গলায় তুলসীমালা। আর সঙ্গে রেখেছেন কাঁথা কমণ্ডলু ও লাঠি। এমন কাঁথা একালে আর মেলে না।

কুপি- কুপি তেল ভরার পাত্র। তেলি সম্প্রদায়ের নিজস্ব শিল্প। কুপি পল্লী জীবনের গুরুত্বপূর্ণ আলোক উপকরণ। দাহ্য তরল পদার্থের ধারক বস্তু। আলোক এবং তরলের নিরাপত্তার সরল সমাধানেই কুপির আবিষ্কার।প্রদীপ পরবর্তী এমন সমাধানের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল কুপি। কুপি এক বদ্ধ কৌটো, যেখানে তেল রাখা হয়। কুপি নানা উপকরণে তৈরি হতে পারে। কখনো মাটির তৈরি, কখনো টিনের, কখনো পেতলের, কখনো বা কাচের উপকরণে কুপি তৈরি হয়। টিনের কুপির ব্যবহারই বেশি। তবে পেতলের কুপির অলংকরণ দৃষ্টিনন্দন। কুপিতে চোঙ থাকে। পল্লীগ্রামে যাকে লম্ফ (ল্যাম্প) বলে, কুপি হল আলোকের তেমনিই বিভিন্ন উপকরণ। কুপীর উর্দ্ধ দিকে চোঙ থাকে। চোঙের মুখে সলতের সাহায্যে তরল তেলের সংযোগে আলো জ্বালানো হয়।কবিকঙ্কণের কাব্যে শিব ভিক্ষায় বেরিয়েছেন। পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে ভিক্ষা চাইছেন। ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের সৃষ্ট শিল্প শিবের হাতে তুলে দিচ্ছেন। এক উদার মানসিকতা পল্লী জীবনে সুবাতাস বইয়ে দিচ্ছে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"কেহ দিল চালু কড়ি কেহ দিল ডালি বড়ি

কুঁপি ভরি তৈল দিল তেলি"। [৭৫]

কালকেতুর গুজরাট নগরেও নানা সম্প্রদায়ের ভিড়। কবি লিখেছেন –

"ময়রা ঘরে পায় খণ্ড গোপ ঘরে দধিভাণ্ড

তেলি ঘরে তৈল কূপী ভরি"। [৭৬]

কুমোরেরা তৈরি করেন মাটির কুপি। ঢোকরা কামারেরা পেতলের কুপি এবং টিনের কুপি তৈরি করেন।

Dictionary of Symbols গ্রন্থে Jean Chevalier এবং Alain Gheerbrant ল্যাম্প সম্পর্কে লিখেছেন – "Lamp symbolism is linked to that of the diffusion of light. [...........]The lamp stands for the human being. Like it, it has a body of clay, a vegetative soul or life – principle, the oil, and a spirit, the flame". (৭৭)

কথু, কুথ, কুথা - কুথ বা কথু হাতির পিঠে ব্যবহৃত এবং প্রকার আস্তরণ বা কম্বল। একে করিকম্বলও বলা হয়। সাধারণত হাতির পিঠে ব্যবহৃত আস্তরণ হলেও অন্য প্রয়োজনেও কথুর ব্যবহার হয়।কুথ নির্মাণে নানা অলংকরণ, কারুকার্য, সর্বোপরি শিল্প নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ তাঁর 'প্রাচীন শিল্প পরিচয়' গ্রন্থে কুথকে শিল্প বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন – "ইহাতে সর্বত্র কম্বল – জাতীয়তা দেখা যায় না। [.......]এই 'কুথ' পূর্বকালে বিশিষ্ট উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হইত। সিংহলদেশের 'কুথ' জগতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।[......]কন্থার প্রয়োজন কুথের দ্বারাও সম্পাদিত হইত।[........]যে জিনিস হাতির পৃষ্ঠে শোভা পাইত, তাহাই কালান্তরে বা দেশান্তরে-ভোজনাসনে এবং শীত নিবারণেও অধিকার লাভ করিয়াছিল"। (৭৮)

ব্যাসদেবের মহাভারতে কুথের উল্লেখ পাওয়া যায়। গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ তাঁর'প্রাচীন শিল্প পরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন – "যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে পৃথিবীস্থ ভূপতিবৃন্দ যে সকল উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে সিংহলদেশীয় কুথেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। - "শতশশ্চ কুথাং স্তত্র সিংহলাঃ সমুপাহরন্।" (৭৯)

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কথ বা কথুর উল্লেখ আছে। ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণেরা এসেছেন। মণ্ডপ তৈরি হয়েছে। শামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। আর বাঁধা হয়েছে কথু। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"কিতা কথুবায় বান্ধা উপরে টানায় চান্দা

ধূপে আমোদিত করে স্থলে।" (৮০)

সুতরাং অভিধান অনুযায়ী হাতির পিঠে কুথের ব্যবহার একমাত্র একচেটিয়া নয়। বাণভট্টের কাদম্বরী কাব্যে আহারের সময়েও চন্দ্রপীড় কুথাসনে বসে আহার করেছেন, সে দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ব্রাহ্মণেরা কুথের (কাঁথা বা ঝালরের) শামিয়ানার মণ্ডপে পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপন করেছেন, সে উল্লেখ কবিকঙ্কণ আমাদের দিয়েছেন।

চিরুনী -

"সকলি তোমার, সখি, হেরি অভিনব,

দেখিতে এসেছি আজি চুলবাঁধা তব।

এক হস্তে কঙ্কতিকা, অপরে সম্বরি'

দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশপাশ সারাবেলা ধরি

....

কি মন্ত্রে ফুটিয়া উঠে স্বর্ণসীথিরেখা

দু'টি করতলচাপে-স্মরপথলেখা

যেন অভিসার লাগি"। [৮১]

চিরুনী কেশচর্চা তথা সৌন্দচর্চার গুরুত্বপূর্ণ শিল্পদ্রব্য। নারীর প্রসাধনের আবশ্যিক উপকরণ চিরুনী। মুকুন্দরামের কাব্যে সেকালে চিরুনী দিয়ে নারীর কেশচর্চা ও প্রসাধনের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিজেকে শীলিত করেছে। সৌন্দর্যচর্চা করেছে। চিরুনী সাধারণ শিল্পদ্রব্য। কিন্তু তার মধ্যেও লোকশিল্পী রেখে গেছে সৌন্দর্যচেতনার ছাপ। অজিত মুখার্জীর পর্যবেক্ষণ এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তাঁর 'Folk art of India' গ্রন্থে লিখেছেন- "A Study of Indian folk art from The Purely aesthetic point of view will reveal that over a wide field in the artistic sensibility of the people, there is a surprising continuity from one epoch to another" [৮২]

মুকুন্দরামের কাব্যের নানা স্থানে চিরুনী এসেছে। দেবী এবং মানবী উভয়ের কেশসজ্জায় চিরুনীর উল্লেখ আছে। নিম্নলিখিত ভাবে কবিকঙ্কণের কাব্যে চিরুনীর উল্লেখ এসেছে -

১. চিরুনী (পৃঃ ১১) ২. চিরুনী (পৃঃ ১৭) ৩. সানা (তাঁতের চিরুনী, পৃঃ ৭৯) ৪. চিরুনী (পৃঃ ১১৯) ৫. চিরুনী (পৃঃ ১৩১) ৬. চিরুনী (পৃঃ ১৩২)

[উপরিলিখিত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যপঞ্জীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া] (৮৩)

দেবাদিদেব মহেশ্বর ভস্ম করেছেন মদনকে। মদন ভস্মের পর সহমরণের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন রতি। অনুমৃতা হতে চেয়েছেন তিনি। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের কঠিন অনুশাসনে আচ্ছন্ন বাংলাদেশ। নারীর চিতায় আরোহণকে পবিত্র মঙ্গল লক্ষণ বলে মনে করতেন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ধারক-বাহকেরা। সতী নারী যখন চিতায় উঠতেন তখন সিঁথিতে পরানো হত সিঁদুর, চিরুনী দিয়ে চুল বিন্যস্ত করানো হত। আম্র পল্লব নাড়া হত। শঙ্খধ্বনি দেওয়া হত। সর্বোপরি রতি চতুর্দোলায় চড়তেন। নির্মম হত্যাকে মহিমান্বিত করার ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের এ এক কৌশল। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রই মধ্যযুগে সামাজিক অভিশাপের জন্ম দিয়েছে। চিরুনী রমণীর একান্ত আদরণীয় লোকশিল্প, যা তার সৌন্দর্যসত্তাকে উদ্ভাসিত করতে সাহায্য করে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"সুরঙ্গ সিন্দুর ভালে চিরনি কুন্তলজালে
সঘনে নাড়েন আম্রডাল"। (৮৪)

স্নানের পর চুল বিন্যস্ত করা আবশ্যক। কিন্তু অভিমানী লহনার তা হয়ে ওঠেনি। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"স্নান করিআ শিরে না দেহ চিরুনী
রৌদ্র নাহি পায় কেশে শিরে বিন্ধে পানি"। (৮৫)

বণিকখণ্ডেও দেখা যাচ্ছে, চিরন্তনী নারীর কেশ পরিচর্যার বিশিষ্ট উপকরণ চিরুনী। সেকালে রমণীরা কেশ পরিচর্যা করতেন। লহনা খুল্লনার কেশ মার্জনা করে দিয়েছেন। কবি লিখেছেন-

“করেতে চিরুনি ধরি কেশরে মার্জনা করি

অঙ্গে দেয় ভূষণ চন্দন”। (৮৬)

‘প্রাচীন শিল্প পরিচয়’ গ্রন্থে গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ চিরুনীকে ‘প্রসাধনী’ শিল্প রূপে উল্লেখ করেছেন। লেখক লিখেছেন-“নববিধ-রাজোপকরণের মধ্যে প্রসাধনী অন্যতম। উহা এখন চিরুনি এবং স্থানে স্থানে কাঁকুই নামে পরিচিত। অভিধানে ইহার কঙ্কতিকা নামও দেখিতে পাওয়া যায়। [....] যুক্তিকল্পতরুকার বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ নৃপতিদিগের জন্য যথাক্রমে দশ, নয়, আট ও সাত অঙ্গুল পরিমিত প্রসাধনী নির্ধারিত হইয়াছে। দেবতার পূজোপকরণরূপেও কঙ্কতিকার ব্যবহার হইয়া থাকে। এই পদার্থ [...] স্বর্ণ অথবা রূপার দ্বারা কঙ্কত নির্মাণ করিতে হইবে। উহার আয়তন অষ্টাঙ্গুল অথবা ষড়ঙ্গুল হইবে, বিস্তার দৈর্ঘ্যের অর্ধেক পরিমিত হইবে, উহার মুখ দুই দিকেই থাকিবে, মুখে কুড়িটি দ্বাদশটি অথবা আটটি দন্ত অর্থাৎ কাঁটা থাকিবে।(৮৭)

<u>ছাতা</u> - ছাতার সৃষ্টি নিয়ে কল্পিত কাহিনী আছে। মহাভারতে বলা হয়েছে, দেবতা সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ছাতার আবিষ্কার। ছাতা কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে তা আজ অজ্ঞাত। প্রয়োজন, বিশেষত ঝড় বৃষ্টি থেকে পরিত্রানের জন্য ছাতার সৃষ্টি। আবিষ্কারক, নাম চিহ্নহীন মানুষ। “প্রাচীন শিল্প পরিচয়” গ্রন্থে গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ লিখেছেন-“কিন্তু কালক্রমে তাহা (সভ্যতার নিদর্শনরূপে) শিল্পোৎকর্ষের সমুন্নত স্থানও অধিকার করিয়াছিল”। (৮৮)

ভোজরাজের যুক্তিকল্পতরুতে দুই শ্রেণীর ছাতার উল্লেখ আছে। সমান্য ও বিশেষ।

ভোজরাজ লিখেছেন- “বিশেষশ্চাথ সামান্যং ছত্রস্য দ্বিবিধা ভিদা।

রাজ্ঞশ্ছত্রং বিশেষাখ্যং সামান্যঞ্চান্যদুচ্যতে।। (৮৯)

রাজার ছাতা বিশেষ ছাতা। আর বাকি সব ছাতা সাধারণ ছাতা। দুর্গাপূজায় দেবীকে ছাতা দানের বিধান এবং সে বিষয়ক মন্ত্রের উল্লেখ আছে। গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ মহাশয় তার গ্রন্থে এই মন্ত্রের উল্লেখ করেছেন-

“ওঁ ছত্রং সুনির্মিতং দেবি বৃষ্টি-রৌদ্রনিবারকম্।

ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা ছত্রঞ্চ প্রতিগৃহ্যতাম্”। (৯০)

কবিকঙ্কণের কাব্যে দেবদেবীর ব্যবহারের ছাতা রাজছত্র এবং সাধারণ ছাতার উল্লেখ আছে। মুকুন্দরামের কাব্যে ছাতার উল্লেখ নিম্নলিখিতভাবে এসেছে-

১. ছাতা (পৃঃ ১০) ২. শ্বেতছত্র (পৃঃ ১১) ৩. ছাতা (পৃঃ ৩১) ৪. ছাতা (পৃঃ ৩১) ৫. ছাতা (পৃঃ ৮৩) ৬. রত্নছাতা (পৃঃ ৯৭) ৭. ছাতা (পৃঃ ১০২) ৮. ছাতা (পৃঃ ১০২) ৯. ছাতা (পৃঃ ১০২) ১০. ছাতা (পৃঃ ১০৩) ১১. ছাতি (পৃঃ ১০৫) ১২. ছাতি (পৃঃ ১০৮) ১৩. ছাতি (পৃঃ ১১৪) ১৪. ছাতি (পৃঃ ২৯২) ১৫. ছাতা (পৃঃ ২৭৬) ১৬. ছাতা (পৃঃ ২৮০)

[উপরিলিখিত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া] (৯১)

কবিকঙ্কণের কাব্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছাতার উল্লেখ এসেছে ভূঞ্যা রাজাদের জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে। ভূঞ্যা রাজারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রধান ‘নরপতি’ দের মাথায় ছাতা ধরেছেন। কখনো কখনো সেবকেরাও প্রভুর মাথায় ছাতা ধরেছেন। কবিকঙ্কণের কাব্যে রাজছত্রের উল্লেখ এসেছে নিম্নলিখিতভাবে-

“বার দিআ বসিয়াছে কলিঙ্গ-ভূপতি

চারিদিগে ভূঞা রাজা শিরে রত্নছাতি”। (৯২)

সেকালে শ্বেতবর্ণের ছাতাকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হত। কাব্যের বিভিন্ন স্থানে শ্বেতবর্ণের ছাতার উল্লেখ করেছেন কবি। দেবী দুর্গা স্বপ্নে ধনপতিকে দেখা দিয়ে বলেছেন-

“কুবুস্কিয়া তোরে কত কহিব বিশেষ

ধরাব ধবল ছাতি বাট্যা দিব দেশ”। (৯৩)

যুগে যুগে ছাতার আয়তন, উপাদান, রঙ এবং উচ্চতার ভিন্নতা এসেছে। সাধারণত রাজছত্র আকারে বড়। এগুলি চন্দনকাঠে নির্মিত হত। ছাতা ধরার সময় নানা নিয়ম কানুন মানা হত। ছাতায় কলসী, হাঁস এবং চামরের চিত্র অঙ্কিত থাকত। রাজছত্র নানা মণিমুক্তা খচিত হত। বনবাসকালে রামচন্দ্রের অনুগমন করেছিলেন ধর্মপ্রাণ

ব্রাহ্মণেরা। তারা বলেছিলেন, জলহীন মেঘের মত শ্বেতশুভ্র ছাতা দেখ। এই ছাতা দিয়ে আমরা তোমাকে ছায়া দেব। বাল্মীকি রামায়ণে বলা হয়েছে-

"বাজপেয় সমুত্থানি ছত্রাণ্যেতানি পশ্য নঃ

পৃষ্ঠতোহনু প্রয়াতানি মেঘানিব জলাত্যয়ে"। [৯৪]

ছাতা নানা প্রতীক সম্বলিত হয়। সেকালের ছাতাতে এমন প্রতীকতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। E.B. Havell তাঁর 'A Handbook of Indian Art' গ্রন্থে লিখেছেন-"The royal umbrella raised on the top on the Stupa was not mere religious symbolism : it was in the first instance a recognition of the social rank, real assumed, of the spiritual teachers whose ashes were deposited there". [৯৫]

পীঠ-

"এবং দত্ত্বা বলিং শক্র ততো দেব্যাবতারয়েৎ|

বিন্যসেদ্ভদ্রপীঠে তু মণ্ডলৈরুপশোভিতাম্"|

অর্থাৎ - "হে শক্র! এইরূপে বলি প্রদানপূর্ব্বক দেবীকে নামাইয়া মণ্ডলাদিশোভিত ভদ্রপীঠে স্থাপন করিবে|"[৯৬]

দেবী রথে আরোহণ করেন| রথে যাতায়াত করেন| সেকালে দেবীকে রথ থেকে নামিয়ে প্রথমে ভদ্রপীঠে স্থাপন করা হত| তারপর কলসের গঙ্গাজল দিয়ে স্নান করিয়ে মঙ্গল বাদ্য এবং পূজা উপকরণ সহকারে পূজা করা হত|পীঠ হারিয়ে যাওয়া বিশিষ্ট লোকশিল্প | পীঠ এক বিশেষ আসন, পীঁড়ি| ব্রতীর আসনরূপেও পীঠ ব্যবহৃত হয়| পীঠ ধাতু নির্মিত, শিলা নির্মিত এবং কাষ্ঠ নির্মিত হতে পারে| ধাতুর মধ্যে লোহা, কাঠের মধ্যে আম, জাম এবং কদম্ব কাঠের পীঠ নিষিদ্ধ| কাষ্ঠ পীঠের মধ্যে গাম্ভারী(গামার), পনস, চন্দন, বকুল প্রভৃতি কাঠ দিয়েই পীঠ নির্মিত হয়| উন্নত পীঠ সুখপীঠ নামে অভিহিত|

সুখপীঠে সিদ্ধি, শুভ, সম্পদ প্রভৃতি গুণ নিহিত থাকে বলে ধারণা করা হয়। এছাড়া রাজপীঠ এবং রাজার হৃদয় মনোরঞ্জনকারী পীঠ কেলিপীঠ নামে পরিচিত।'প্রাচীন শিল্প পরিচয়' গ্রন্থে গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ লিখেছেন – "পীঠ যথাক্রমে পীঠারোহীর ধন, ভোগ, সুখ, ঐশ্বর্য ও অভিলষিত অর্থ প্রদান করিয়া থাকে"।[৯৭]

গাম্ভারী, গম্ভারী বা গামার কাঠের (গাম্ভীর গাছ, Gmelina arborea) তৈরি পীঠ শুভ পীঠ রূপে চিহ্নিত। গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ তাঁর 'প্রাচীন শিল্প পরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন – "ইহাদের মধ্যে গাম্ভারীকাষ্ঠনির্মিত 'শুভ' – সংজ্ঞক পীঠ, [.......] রাজার অভিষেক কার্যে-ব্যবহার্য"। [৯৮] সূত্রধর বা ছুতোরেরা এমন পীঠ তৈরি করেন। পীঠ নির্মাণে শুভাশুভবোধ, জ্যোতিষ বিচার এবং হিন্দুর শাস্ত্রীয় আচার আচরণ ও সংস্কার পালন করা হয়। কবিকঙ্কণের কাব্যে এমন গামার কাঠের পীঠের উল্লেখ আছে। বণিকখণ্ডে মঙ্গল অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সাধু ধনপতি দত্ত এমন পীঠে উপবেশন করেছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"সাধু ধনপতি মদন জিনি মূর্তি
বসিলা গাম্ভারির পীঠে।" [৯৯]

মধ্যযুগের সাহিত্যে বিভিন্ন পীঠের উল্লেখ আছে। রামেশ্বরের 'শিবায়ন' কাব্যে 'হেমপীঠ' 'পুরট(সুবর্ণ)পীঠ' – এর উল্লেখ আছে –"হেমপীঠে হিমালয় বসাইল হরে"(পৃ:৩৮৬) [১০০] কিংবা – 'পাতিত পুরট পীঠে পুরহর বৈসে'।[১০১] প্রাচীন এবং মধ্যযুগে পীঠ অসাধারণ মর্যাদার আসনরূপে চিহ্নিত ছিল। সংস্কার, বিশ্বাস, জ্যোতিষ, দেববাদ, পৌরাণিকতা পীঠের আসনকে স্বতন্ত্র রূপ দিয়েছিল।বাংলার সমাজ সংস্কৃতিতে পীঠ পবিত্র আসনরূপে বিশেষ উচ্চতা পেয়েছিল।এক হারিয়ে যাওয়া সময় প্রতিভাত হচ্ছে পীঠের আলোচনায়।

<u>পাশা</u>- পাশা হল অক্ষ। পাশাখেলার ঘুটি হল অক্ষ। পাশাখেলাকে দ্যূতক্রীড়াও বলা হয়। মহাভারতের যুগে যেমন পাশার প্রচলন ছিল, তেমনি মঙ্গলকাব্যের কালেও পাশাখেলার প্রচলন ছিল। পাশাখেলা সেকালের রাজা – রাজড়া এবং অভিজাত সমাজের অঙ্গ ছিল। আখেটিক খণ্ডে দেবী চণ্ডীর অনুগ্রহে কালকেতু গুজরাট নগর পত্তন

করেছেন। অর্থ জীবনাচরণের পরিবর্তন ঘটায়। কালকেতুও খেলেছেন পাশা। কবিকঙ্কণ লিখেছেন- 'কেহ গেল বীর জথা খেলেছেন পাশা।' [১০২]

বণিকখণ্ডে পাশাখেলায় আনন্দের কথা বলা হয়েছে, -

"তুমি গেলে পরবাস দুঃখ পাইলে বারমাস

দুর গেল পাশার কৌতুক"। [১০৩]

বণিক খণ্ডে মন্ত্রশক্তি প্রয়োগ করে পাশাকে বশ করার কথা বলা হয়েছে। মহাভারতে শকুনির পাশা শকুনির বশে ছিল। আর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লক্ষ করা যাচ্ছে, সওদাগর ধনপতি দত্ত পাশায় মন্ত্রের প্রয়োগ করে খুল্লনাকে পাশাখেলায় পরাজিত করেছেন। এবং পণ হিসাবে খুল্লনার সাহচর্য কামনা করেছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"খুল্লনারে বলে সাধু আন প্রিয়া পাশা

তোমা সঙ্গে রসরঙ্গে গোঞাইব নিশা।

মন্ত্রবলে সদাগর পাশা কৈল বশ

ডাক দিআ ধনপতি দান পেলে দশ।

....

পাশাতে জিনিল সাধু মন্ত্রের বলে

পণ দাঅ চাহে সাধু ধরিআ অঞ্চলে"।[১০৪]

অতিরিক্ত পাশাখেলা বুদ্ধি নাশ করে, সংসারে সর্বনাশ ডেকে আনে। লোকসমাজে প্রচলিত আছে—'তাস পাশা বুদ্ধি নাশা'–এই সত্য কথাটি। ধনপতি দত্ত পাশায় মজেছেন। সংসার নষ্ট হয়েছে, কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

'সখা সনে সাধু পাশা খেলে পাটশালে

লহনা আসিআ তার শিরে জল ঢালে'।[১০৫]

পাশা প্রাচীন খেলা। পাশা খেলার ঘুটি কেমন ছিল তা আজ বোঝা কঠিন।চতুর এবং ধূর্ত ব্যক্তি পাশা খেলায় দক্ষ হতেন। দক্ষ ব্যক্তিই বুঝতে পারতেন, পাশায় কোন সংখ্যা পড়তে পারে। মহাভারতের শকুনি 'দ্যুতজ্ঞঃ'। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের মূলে ছিল পাশাখেলার প্রতারণা। মহাভারতে শকুনির কাছে পণ (বাজি) তাঁর ধনুক। পাশক তাঁর বাণ, পাশকের অবস্থা তাঁর গুণ এবং আসন তাঁর রথ। মহাকবি ব্যাসদেব লিখেছেন—

"অক্ষাণ্ ক্ষিপন্নক্ষবিদ্ধে বিদ্বানবিদুষো জয়ে

গ্লহান্ ধনূংষি মো বিদ্ধি শরানক্ষাংশ ভারত!"।[১০৬]

ধূর্ত শকুনি পাশা দিয়েই যুধিষ্ঠিরের সর্বস্ব হরণ করতে চেয়েছেন। পাশাখেলা বহুকাল আগেই লুপ্ত হয়ে গেছে। সেকালের মানুষের ধর্মবোধ, জীবন-রুচি, বিচারবোধ এবং সংস্কৃতির ছাপ ফুটে উঠেছে মহাভারতে। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও পাশাখেলায় মন্ত্র তন্ত্রের প্রভাব লক্ষ করা যায়। অতীত যুগের স্মৃতিকে ফেলে এসেছি আমরা।

পামরি (অলংকৃত সূচীকর্ম) - পামরি এক ধরনের উত্তরীয়। কারুকার্য খচিত রেশমী বস্ত্র 'পামরী'। এক চমৎকার অলংকৃত সূচি কর্মের দ্যোতনা থাকে এই শিল্পকলায়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বণিক খন্ডে পামরির উল্লেখ এসেছে। খুল্লনা অগ্নিপরীক্ষার কঠিন বাধায় বিঘ্নজয়ী হয়েছেন। প্রতিবেশী বন্ধুগণ ধনপতির বাড়িতে আমন্ত্রিত। রন্ধন কুশলী খুল্লনা ব্যঞ্জন প্রস্তুত করছেন। আমন্ত্রিত বিশিষ্টজন এবং ঋষিরা। আহারান্তে সম্মানীয় অতিথিদের উপঢৌকন দিয়ে বিদায় করছেন সওদাগর ধনপতি দত্ত। অন্যান্য উপহারের সঙ্গে উপহার স্বরূপ দিয়েছেন 'বিচিত্র পামরি'। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"সাতগাঁয়ের বান্যা পাইল বিচিত্র পামরি"। [১০৭]

সেকালে উপঢৌকন স্বরূপ ব্রাহ্মণদের পামরি দান করা হত। ধনপতি দত্ত এমন পামরি দিয়েছেন-

"কপাল জুড়িআ ফোঁটা   নিবসে পণ্ডিতঘটা

সগল্লাথ পামরি কম্বলে"। [১০৮]

যুদ্ধক্ষেত্রে পাইকেরা (পদাতিক সৈন্য) চলেছেন শোভাযাত্রা সহকারে। সিংহলরাজের সঙ্গে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়েছেন শ্রীমন্ত। সৈন্যদের গায়ে পামরি। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"ঢোকনিঞা পাইক ঢোকন শোভা করে

হাণ্ডিআ চামর বান্ধে বাঁশের উপরে।

বিচিত্র পামরি গায় পারিজাতমালা

বৈরিবেশে ধায় পাইক জানে যুদ্ধকলা"। [১০৯]

সেকালের বাণিজ্য বিনিময়ে পামরির উল্লেখ করেছেন কবি। পাটির বিনিময়ে কম্বল নিয়ে এসেছেন বণিক ধনপতি দত্ত। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"সকল্লাথ পামরী কম্বল পাব বদল করিআ পাটি"। [১১০]

সংস্কৃতি স্থির নয়, তা গতিশীল। নদীর স্রোতের মত প্রবহমান। একসময়ের পোশাক-আসাক, খাদ্যতালিকা, জীবনরুচি পরবর্তী সময়ে বদলে যায়। মধ্যযুগের লোকসমাজে পামরি নামের এমন উত্তরীয়ের ব্যবহার ছিল। সামাজিক অনুষ্ঠানে অতি্থিদের সম্মান জানানোর জন্য উপহারস্বরূপ 'পামরি'র ব্যবহার ছিল। তাছাড়া সেকালে বিনিময় বাণিজ্যের উপকরণরূপে 'পামরির' উল্লেখ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যাচ্ছে। 'পামরি' এক সময়ের শিল্পকর্ম রূপে সমাজে বিশেষ জায়গা নিয়েছিল। সময়ের সাথে সাথে 'পামরি' নামের এমন শিল্পকলা হারিয়ে গেছে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পাতায় একটি যুগকে চিহ্নিত করেছেন।

পিঁড়া, পিঁড়ি - পিঁড়া বা পিঁড়ি এক ধরনের আসন। এমন আসনকে 'পীঠ' নামেও অভিহিত করা হয়। কবিকঙ্কণের কাব্যের নানা স্থানে এমন পীঠ বা পিঁড়ার উল্লেখ আছে। ধাতু, পাথর বা কাঠ দিয়ে এমন পিঁড়া তৈরি করা হয়। মহারাজ ভোজের 'যুক্তিকল্পতরু' গ্রন্থে বলা হয়েছে-

"ধাতু পাষাণকাষ্ঠৈশ্চ পীঠস্ত্রিবিধ উচ্যতে।

ধাতুবশ্চ শিলাশ্চৈব কাষ্ঠানি বিবিধানিচ"। (১১১)

কবিকঙ্কণের কাব্যে যেমন গাম্ভারের পীঠের উল্লেখ আছে, তেমনি চন্দন কাঠের পিঁড়ার উল্লেখ আছে। চন্দন কাঠের পিঁড়া 'সুখপীঠ' নামে চিহ্নিত। সংস্কৃত গ্রন্থে বলা হয়েছে-

"চান্দনস্তু সুখ: পীঠো (?) অভিষেকে মহীভুজাম্"। (১১২)

লক্ষণীয় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আখেটিক খণ্ডেই পিঁড়ার ব্যবহার এসেছে। আবার কালকেতু যখন দেবী চণ্ডীর কৃপায় সম্পদ লাভ করেছেন, তখন তিনি কিনেছেন চন্দন কাঠের পিঁড়া। তাছাড়া পিঁড়া দরিদ্র পল্লিজীবনের অত্যাবশ্যক লোকশিল্প। কবিকঙ্কণের কাব্যে নারীদের পতি নিন্দা বর্ণিত হয়েছে। পতি নিন্দার মধ্যে সেকালের নারীর নিগূঢ় মনোগত বাসনা প্রতিফলিত হয়েছে। নারীর আত্মযন্ত্রণা ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে এ এক নীরব প্রতিবাদ। অত্যাচারিত নারীর অভিমান, অব্যক্ত হৃদয়ের বিক্ষুব্ধ ক্রন্দন, সেই সুদূর মধ্যযুগের ঘনায়মান মেঘাচ্ছন্ন আকাশে ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক অনুশাসনও ব্যক্ত করেছেন কবি। কোন স্বামী তাঁর স্ত্রীকে পিঁড়ার বাড়ি মেরেছেন। গৌরীর বিবাহে কোন এক পড়শী বলেছেন-

"জে দিবস আমি দ্রড় ব্যঞ্জন রাঁধি।

মারএ পিড়ার বাড়ি কোনে বস্যা কান্দি"। (১১৩)

অনার্য রমণী ফুল্লরা। দারিদ্র্য জর্জর জীবনের ছাপ স্পষ্ট। ব্যাধ রমণী মাংস বিক্রি করেন, মাংস বিকায় না। সখীর বাড়িতে গেছেন খুদ ধার করতে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে অভাব ছিল, অনটন ছিল কিন্তু প্রতিবেশী আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে ছিল প্রীতির সম্পর্ক। সেকালের গ্রাম বাংলা কসমোপলিটন কলকাতা হয়ে যায় নি। মধ্যযুগের বাংলায় মানুষে মানুষে সুস্থ আন্তরিকতা ও প্রীতির ছোঁয়া থেকে গেছে বরাবর। সই ফুল্লরাকে ফেরায় নি। দিয়েছেন খই মুড়ি, আর বসার জন্য দিয়েছেন 'চৌখণ্ডি পিড়ি'। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"আঁচল ভরিআ সই দিল খই মুড়ি

চাপিআ বসিল দোঁহে চৌখণ্ডি পিড়ি"। (১১৪)

কালকেতু দেবীর কৃপায় সম্পদ লাভ করেছেন। গোলাহাট থেকে কিনেছেন, চন্দন কাঠের পিঁড়া। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"চন্দন তরুর পিড়া লম্বিত মুকুতা চূড়া

কিনে দোলা রত্নে ভূষিত"। (১১৫)

চন্দন কাঠের পিড়া ধন, ভোগ, সুখ, ঐশ্বর্য ও অভিলষিত অর্থ দিয়ে থাকে। এই পিঁড়া সুখপীঠ নামে চিহ্নিত। দেবী চণ্ডীর পুরী নির্মাণেও পিঁড়ার উল্লেখ এসেছে-

"মাজ্যা পিড়া খোপনা বান্ধে দিআ শিলা"।(১১৬)

কিংবা-

"চারি চৌরি চতু:শালা মাঝে পিড়া খো ঢালা"। (১১৭)

আবার খুল্লনার বিবাহে কোন এক পল্লীরমণী তাঁর আত্মযন্ত্রণার কথা বলেছেন-

"মারয়ে পিঁড়ার বাড়ি কোণে বস্যা কান্দি"। (১১৮)

পিঁড়া গৃহস্থালী উপকরণ। কিন্তু তক্ষণ শিল্পীরা শুধু শুধু ব্যবহারিক উপকরণ রূপে পিঁড়াকে তৈরি করেন নি। পিঁড়ায় তক্ষণ শিল্পীরা তাদের কারু কৌশল এবং সৌন্দর্যচর্চার ছাপ রেখে গেছেন। পিঁড়াকে সুন্দর করেছেন এবং বিশেষ ভাবে নির্বাচন করে স্থায়িত্ব দিয়েছেন। সাধারণ গৃহস্থ গৃহদেবতার পুজোতে পিঁড়ায় বসে পুজো করেন। কখনও কখনও সিংহাসন ছাড়াও পিঁড়াতে গৃহ দেব-দেবীকে বসান হয়। পিঁড়াতে সিঁদুর দিয়ে ধূপ দীপ সহকারে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান পালন করা হয়। একালে অবশ্য এগুলি কমে এসেছে। শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'দারুশিল্প' প্রবন্ধে লিখেছেন-"গৃহসজ্জায় রুচির মুল্য অনেক। [...] বিশেষে অনেকগুলি আসবাবের দ্বারা গৃহসজ্জা হয়। সেগুলির পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য ও সমতা থাকা উচিত। অল্প জিনিসে-সুদৃশ্য ও রুচিসংগত

হইলে- গৃহের যা শোভা হয়, গৃহকে আসবাবের দোকানে পরিণত করিলে তাহা সম্ভব নহে"।(১১৯)

পিঁজরা - চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উল্লেখযোগ্য একটি লোকশিল্প হল পিঁজরা। বণিকখণ্ডে পিঁজরার উল্লেখ আছে। ধনপতি দত্ত জাতিতে গন্ধ বণিক। মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে কারুশিল্পীদের কথা বলেছেন। কারুশিল্পীরা তাঁর কাব্যে কামিলা নামে উপস্থিত। তারা নির্মাণ করবেন 'সুবর্ণ পিঞ্জর'। এই পিঁজরা কোন সাধারণ পিঁজরা নয়। কোন একক শিল্পীর সৃষ্টিকর্ম নয়। সম্মিলিতভাবে অনেকে মিলে নির্মাণ করেন এমন পিঁজরা। দশ-বিশ জন মিলে রাত্রি দিন করে যদি কাজ করেন তবে এমন পিঁজরা তৈরি করতে সময় লাগে ছয় মাস। কারুশিল্পীরা পিঁজরা তৈরির জন্য কারখানা ঘর তৈরি করেন। তারা দায়িত্ব এবং কর্তব্য ভাগ করে নেয়। সম্মিলিতভাবে বারোজন কারুশিল্পী মিলে তৈরি করেন 'সুবর্ণ পিঞ্জর'। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

" নিবন্ধ করিআ কয় সুবর্ণ জুখিয়া লয়

কামিলা পাতিল কারখানা।

কেহ কাটে কেহ পোড়ে কেহ কেহ ফুল গড়ে

সুবন্ধানে কেহ টানে গুনা।

কামিলা দ্বাদশ জনা সভে হয়্যা দৃঢ়মনা

গড়ে তারা সুবর্ণপঞ্জর"।। (১২০)

রাজার পাখি পোষার ইচ্ছে। সাধারণ পাখি নয়, আশ্চর্য কথা বলা পাখি। খুল্লনাকে বিবাহের পরে সোনার খাঁচা নির্মাণের জন্য ধনপতিকে গৌড়ে যেতে হয়। সওদাগর ধনপতির শখের খাঁচা। কিন্তু খাঁচা নির্মাণের মূল স্রষ্টারা হলেন ব্রাত্য কারুশিল্পীরা- তারা হলেন 'কামিলা'।এমন সৃষ্টিশীল নির্মাণে এক বছর সময় অতিবাহিত হয়। ধনপতির অবর্তমানে খুল্লনার জীবনে নেমে আসে ভয়ানক ট্র্যাজেডী। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কারুশিল্পীদের এমন চমৎকার নির্মাণশৈলীর পরিচয় রেখে গেছেন মুকুন্দরাম।

পুঁথি, পাঁজি - বাংলাদেশের পুঁথি শুধু বাংলার নিজস্ব সম্পদ নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের জাতীয় গৌরব। এদেশ ছিল অনার্য মানুষের দেশ। এই দেশ বৌদ্ধের ভারতবর্ষ, জৈনের ভারতবর্ষ, অব্রাহ্মণদের ভারতবর্ষ। পরবর্তীকালে আর্য ধর্ম, আর্য রীতি-নীতি, আর্য সংস্কার এবং আর্য বিদ্যায় নবরূপ লাভ করেছে। প্রধানত একাজ করেছেন বাঙালি ব্রাহ্মণেরা। এমনকি প্রবল রাজশক্তির বিরুদ্ধে একাজ করার জন্য তারা অলৌকিক ঈশ্বরকে কাজে লাগিয়েছেন। পুঁথি তাদেরই সৃষ্টি। পুঁথি লেখা, পুঁথি চিত্র, পুঁথির মধ্যে পৌরাণিক মহিমা আরোপ ব্রাহ্মণদের দান। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'প্রাচীন বাংলার গৌরব' গ্রন্থের 'বাঙালি ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধে লিখেছেন – "চারিদিকের লোকে জানে বাংলা হিন্দুধর্মের দেশ- এটা কে করিল? [.....] বাঙালি ব্রাহ্মণেরাই এই কাজটি করিয়াছেন। [.....] স্মৃতি, দর্শন, বৈষ্ণব ধর্ম, শাক্ত ধর্ম তাঁহাদের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতেই ব্রাহ্মণেরা নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, দেশীয় ভাষায় ছড়া লিখিয়া, দেশীয় ভাষায় গান গাইয়া বৌদ্ধেরা কেমন দেশটাকে মাতাইয়া তুলিত। সুতরাং এ দেশ মাতাইতে হইলে যে মাতৃভাষা ভিন্ন হয় না, এ তাঁহাদের বেশ জ্ঞান হইয়াছিল। তাই তাঁহারা প্রথমেই রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি বাংলা করা আরম্ভ করিয়া দেন"।[১২১]

একথা ঠিক, প্রাচীন বাংলার ব্রাহ্মণেরাই বাংলা পুঁথি লেখেন, পুঁথি চিত্র অঙ্কন করেন। সাধারণত রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের বিষয় পুঁথিতে অঙ্কিত হয়। পুঁথিতে অঙ্কিত হয় পৌরাণিক মাতৃকামূর্তি, রাধাকৃষ্ণ মূর্তি, রথ, মন্দির, গাছ-গাছালি, ফুল প্রকৃতি, কোনটিতে কৃষ্ণের দশাবতার মূর্তি। পুঁথির অনেক চিত্রই রেখাচিত্র। 'প্রাচীন শিল্প পরিচয়' গ্রন্থে গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ তাঁর 'চিত্রবিদ্যা' প্রবন্ধে লিখেছেন – " রেখাই চিত্রের প্রধান অঙ্গ। কারণ, অঙ্গপ্রতঙ্গ প্রভৃতির পরিমাণ ও সংস্থানের অভিব্যক্তি প্রথমত: কেবল রেখাপাতের দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বর্ণান্তরের অভাবেও কেবল অঙ্কন-ক্রিয়ার দ্বারাই মনুষ্যাদির আকৃতি বিন্যস্ত হইতে পারে"।[১২২] এমন পুঁথির চিত্রগুলি সাধারণত তালপাতার তেলতেলে পৃষ্ঠায় অঙ্কিত হয়, কখনো কাঠের উপর পুঁথিকে জড়িয়ে চিত্র অঙ্কিত হয়। এই পুঁথিগুলি লোকশিল্প। 'বাংলার লোকশিল্প' গ্রন্থে ড. প্রদ্যোত ঘোষ তাঁর ' পুঁথিচিত্র' প্রবন্ধে লিখেছেন – "অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতী

১৬৮৯ সালে নকল করা দশম শতাব্দীর 'ভাগবতপুরাণ' এর দশম স্কন্দের একটি পুঁথির উল্লেখ করে বলেছেন যে এ পর্বের পুঁথিচিত্র লোকশিল্পের অন্তর্গত"। [১২৩]

বাংলাদেশের নানা স্থানে প্রাচীন পুঁথির অনুসন্ধান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে মহিষাদলের রাজবাড়ীতে প্রাপ্ত পুঁথিটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রাপ্ত রামচরিত মানসের পুঁথিচিত্রে রঙের প্রয়োগ এবং রেখার টান দৃষ্টিনন্দন।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন স্থানে পুঁথির উল্লেখ এসেছে। দেব খণ্ডের 'বন্দনা' অংশের 'সরস্বতী বন্দনা' অংশে পুঁথির উল্লেখ আছে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"নিরন্তর আছে সঙ্গী মসী পত্র পুঁথি খুঙ্গি

স্মঙরনে জড়িমা জায় দূরে"। [১২৪]

কালকেতু গুজরাটে নগর পত্তন করেছেন। এসেছেন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য –

"পরিআ উজ্জ্বল ধুতি কাখে করি লয়া পুথি

গুজুরাটে বৈদ্যজন ফিরে"। [১২৫]

ভাঁড়ু দত্ত কালকেতুর কাছ থেকে রাজভেট গ্রহণ করছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"পাগখানি বান্ধে ভাঁণ্ড়ু নামি ঢাকে কেশ

কেসরিআর তিলকে রঞ্জিত কৈল বেশ।

কৈফিতের পাঁজিখান নিল সাবধানে

হরি শ্রুতি করিয়া কলম গোঁজে কানে"।[১২৬]

দেবীর কৃপায় এবং ব্রাহ্মণের সঞ্জীবনী মন্ত্রগুণে কলিঙ্গ রাজের সঙ্গে যুদ্ধে কালকেতুর মৃত সৈন্যরা বেঁচে উঠেছেন। ব্রাহ্মণদের হাতে কাঁখে 'পুরাণ-পুঁথি'। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"পরিআ উজ্জ্বল ধুতি কাখেতে পুরাণ-পুথি

হাতে কুশে নাচে পুরোহিত"। [১২৭]

বণিকখণ্ডেও পুঁথির উল্লেখ আছে। বিবাহের লগ্ন বিচার, জ্যোতিষ বিচার এবং নক্ষত্র বিচারের প্রয়োজনে পুঁথির আশ্রয় নেন ব্রাহ্মণেরা। শ্রীপতির বিবাহ উপলক্ষ্যে এরকম পুঁথির উল্লেখ করেছেন কবিকঙ্কণ। মুকুন্দরাম লিখেছেন –

"চণ্ডীর আদেশে বসিল পদ্মাবতী

ডানি করে নিল খড়ি বাম করে পুথি।

সপ্তশলা আদি লগ্ন করিআ বিচার

বিবাহের লগ্ন পদ্মা কৈল সরোদ্ধার

নক্ষত্র বেরতী শুভ যোগ রবিবার

ইহা বই বিবাহের লগ্ন নাহি আর"। [১২৮]

বাংলার পুঁথি চিত্রের পুরাণবর্ণিত মূর্তিগুলি যেন ভারতীয় চিত্রকলার সঙ্গে অন্বিত ধ্যানের মূর্তি। অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'পৌষ ১৩৩৫' সংখ্যার 'একখানা প্রাচীন পুঁথির মলাট চিত্র' প্রবন্ধে লিখেছেন – "কৌপীন পরিহিত পদ্মাসনোপবিষ্ট, পুথির পাটার উপর দশাবতারের [....] এই মূর্তিগুলি পুরাণবর্ণিত ধ্যানকে আদর্শ করিয়া আঁকা হইয়াছে। ধ্যানের সহিত মিলাইয়া চিত্রগুলি দেখিলেই যে কেহ তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন"। [১২৯]

সেকালে মোটা বই, পুঁথি, বিশেষত রামায়ণ মহাভারতের মত উঁচু বই ভাঁজ করা কাঠের উপরে রাখা হত। দু'দিকে মেলে ধরা তক্তার মত বস্তু, যার নাম 'ব্যাসাসন'-এ রেখে বই পড়া হত। ব্যাসাসন তৈরির জন্য শাল, সেগুন বা নিম কাঠ ব্যবহার করা হত। ধর্মপ্রাণ বাঙালি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ভাগবত প্রভৃতি ধর্মপুস্তক ব্যাসাসনে রেখে পড়তেন। পুরানো পুঁথি এভাবে মেলে পড়লে সহজে নষ্ট হত না। বিশেষত সন্ধ্যায় এগুলি পড়া হত। সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে বংশ পরম্পরায় ঠাকুরদা-পুত্র-প্রপৌত্র পর্যন্ত সব পড়ার অভ্যাস তৈরি হয়েছিল। প্রবীণ মানুষেরা আজো এসব স্মৃতি হাতড়ে ফেরেন। আর পাঁজি তো বাঙালি দিনপঞ্জী তথা সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ আকর গ্রন্থ। সংস্কার বিশ্বাস এবং

ধর্মাচার বাঙালি জীবনে কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে এগুলির ব্যবহার ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

পাটী (পাশার চালনকাঠি) - পাশাখেলার চালনকাঠিকে পাটী বলা হয়। কবিকঙ্কণের কাব্যে ধনপতি এবং খুল্লনার মিলন বর্ণনায় এমন পাটীর উল্লেখ আছে। কাব্যে ধনপতি দত্ত এবং খুল্লনা এই দম্পতি পাশা খেলেছেন। এই প্রসঙ্গেই কবিকঙ্কণ পাটীর উল্লেখ করেছেন বেশ কয়েকবার –

ক) "খুল্লনা পেলিল পাটী পড়িল বামঞ্চ"। (১৩০)

খ) "বান্ধিআ খুল্লনা পাটী লয় আরবার"। (১৩১)

গ) "বিঘটিত হয়্যা পাটী পড়ে দুয়া চারি"। (১৩২)

ঘ) "পাটীর পড়নে বুঝি আপনার হারি"। (১৩৩)

পাশাখেলায় অনিষ্ট আছে। আছে কপটতা। বিশেষত অক্ষপ্রিয়, অক্ষনিপুণ, কৌশলী হস্ত, ধূর্ত ছল পরায়ণ ব্যক্তিরাই সাধারণত পাশার চালন কাঠিকে ব্যবহার করে জয় নির্ধারণ করেন। দ্যূত নিপুণ ব্যক্তিদের চালনকাঠি প্রধান সহায়। মহাভারতে পাশা খেলার পূর্বে যুধিষ্ঠির কৌশলপ্রিয় ছল পরায়ণ খেলুড়েদের দ্বারা অনিষ্ট আশঙ্কা করেছিলেন –

"মহাভয়াঃ কিতবাঃ সন্নিবিষ্টা মায়োপধা দেবিতারোহত্র সন্তি।

ধাত্রা তু দিষ্টস্য বশে কিলেদং ন দেবনং কিতবৈরদ্য তৈর্মে"। ।।১৪।। (১৩৪)

ঋগ্বেদ সংহিতায় পাশাখেলার দেবতা কল্পনা করা হয়েছে। অর্থাৎ বেদের যুগে পাশাখেলার প্রচলন ছিল। বৈদিক ঋষি বলেছেন, বড় বড় পাশাগুলি যখন ছকের উপর সঞ্চালিত হয়, তখন তা দেখে আনন্দ অনুভব হয়। পাশা তৈরি হত বিভীত কাষ্ঠের দ্বারা। ঋষিবাক্য এরকম, মূজবান নামের পর্বতে যে চমৎকার সোমলতা জন্মে, তার রস পান করতে যেমন আনন্দ হয়, ঠিক তেমনি বিভীত কাষ্ঠ দিয়ে তৈরি অক্ষ প্রীতিকর। তা ঋষিকে উৎসাহিত করে। ঋগ্বেদ সংহিতার ১০ মণ্ডলের ৩৪ সূক্তে বলা হয়েছে –

"প্রাবেপা মা বৃহতো মাদয়ংতি প্রবাতেজা ইরিণে বর্বৃতানাঃ।

সোমস্যেব মৌজবতস্য ভক্ষো বিভীদকো জাগৃবির্মহ্যমচ্ছান্"। ।।১।। (১৩৫)

দর্পণ - দর্পণ প্রাচীন লোকশিল্পের অন্তর্গত। প্রাচীনকালে দর্পণ, স্বর্ণ, রজত, রঙ্গ ও লোহা এই চার প্রকার ধাতু দ্বারা নির্মিত হত। 'যুক্তিকল্পতরু' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে – "দর্পণ: স্বর্ণ-রজত-এপু-লৌহসমুদ্ভবঃ"। (১৩৬)

রামায়ণে দর্পণ বাণের উল্লেখ আছে। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুনিধনে এই বাণ ব্যবহার করা হত। সৌন্দর্য সন্ধানী মানুষ বিলাস উপকরণ রূপে দর্পণের ব্যবহার করেছেন। নিজের মুখদর্শনের প্রয়োজনে, দেব পূজায়, মন্ত্র-তন্ত্র-অলৌকিকতা ও দৈব দুর্বিপাকে, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে এবং সামাজিক ক্ষেত্রের নানা প্রয়োজনে মানুষ দর্পণের ব্যবহার করেন। একালে দর্পণ বা আয়না সাধারণত কাচের তৈরি হয়। গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ তাঁর 'প্রাচীন শিল্প পরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন – "দর্পণ রাজাদিগের অষ্টম উপকরণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। [.....] কিন্তু সেকালে কাচ-দর্পণের উদ্ভাবন হইয়াছিল কিনা, যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে তাহার কোন উল্লেখ নাই। [.....] অষ্টপ্রকার ধাতুর মিশ্রণে নির্মিত দর্পণ, সকলের পক্ষেই ব্যবহার্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। [....] দৈব দর্পণের ব্যবহারে সর্বার্থ সিদ্ধ হয়। মানুষ দর্পণের ব্যবহারে সুখসম্পদ লাভ হয়"। (১৩৭)

কাঁসার দ্বারাও দর্পণ নির্মিত হয়। অতীতের কিছু রীতি প্রথা উত্তরাধিকার সূত্রে একালেও চলে এসেছে। কাঁসার দর্পণ নাপিতের বাক্সে রক্ষিত থাকে। দেবতার স্নানে দর্পণ প্রয়োজন হয়। হিন্দু বিবাহে বরের মঙ্গল কামনায় হাতে দর্পণ ধরানো হয়।

লক্ষণীয়, কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অনেক স্থানেই চামর এবং দর্পণ পাশাপাশি অবস্থান করেছে। আখেটিক খণ্ডে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা চণ্ডীর জন্য দেউল নির্মাণ করেছেন। মন্দিরের চারিদিকে যে প্রাচীর নির্মিত হয়েছে, সেই প্রাচীরের চারধারে দর্পণ দিয়ে সাজানো হয়েছে –

"রসান দর্পণ লাগে চারিদিকে বেড়া।

ধবল চামর দিল ত্রিসক পতাকা"। (১৩৮)

দেবখণ্ডে শিবের কাছ থেকে দক্ষযজ্ঞে যাওয়ার অনুমতি পাননি পার্বতী। তিনি নিষেধ অমান্য করে যজ্ঞে চলেছেন। শিবের ইঙ্গিতে চিরুনী এবং দর্পণ নিয়ে চলেছেন নন্দীভৃঙ্গী –

"সারিকা সিন্দূর-পেড়ি পিছে লৈয়া ধায় চেড়ি

কেহ লইল চিরনি দর্পণ"। (১৩৯)

ফুল্লরার বিবাহ উৎসব। গন্ধ অধিবাস। দেওয়ালে আলপনা দেওয়া হয়েছে। এমন মঙ্গল অনুষ্ঠানে দর্পণের প্রয়োজন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"শঙ্খ কজ্জল সোনা [তাম্র] অভ্র গোরোচনা

চামর দর্পণ কর্ণপুর"। (১৪০)

আবার বণিক খণ্ডে ফাল্গুন মাসে খুল্লনার বিবাহ উৎসবে দর্পণের উল্লেখ এসেছে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"গোরচনা দিল শঙ্খ চামর চন্দনপঙ্ক

ফুলমালা কজ্জল দর্পণ"। (১৪১)

বিবাহের মত এমন শুভ অনুষ্ঠানে প্রতিমা পূজায় পুনরায় এসেছে দর্পণের উল্লেখ –

"রজত দর্পণ ক্ষেম স্বস্তিক সিন্দুর হেম

কজ্জল গোরোচনা যথাবিধি"। (১৪২)

সেকালে সন্তানহীনা রমণীরা সমাজে অপাংক্তেয় ছিলেন। তাঁদের 'বাঁজি' বলে অসম্মান করা হত। অপরপক্ষে সন্তানবতী রমণীদের সৌন্দর্য গর্ব ছিল। লহনা ছিলেন সন্তানহীনা 'বাঁজি' রমণী। আর পুত্রবতী রমণীরা পুত্র সরোবরে স্নান করে যৌবন গর্বে হাতে রাখতেন দর্পণ। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"অধরে তাম্বুলরাগ চুয়া চন্দন-ছটা হাথে দর্পণ নিরন্তর নেহালে বদন

গনগর্বিত দেখ্যা বুকে না দেই বসন”।[১৪৩]

বণিক খণ্ডে ধনপতি দত্তের নৌযাত্রার সময়ে শুভক্ষণ বিবেচনা করে যাত্রা শুরু করা হত। এমন শুভক্ষণে চামর দর্পণ মঙ্গল দ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হত। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

“করিআ শুভক্ষণ চামর দর্পণ

তীরধ্বজ আগে বান্ধে”।[১৪৪]

শত শত বৎসরের পরিশীলিত জীবনচর্যার প্রয়াস বাঙালির সাধনার বস্তু। শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তি নয়, ব্যক্তি এবং সমাজের যা কিছু কল্যাণকর মানবসমাজ একটু একটু করে তাকে গ্রহণ করেছে। আমাদের চিন্তা চেতনায় শুভবোধ সদা জাগ্রত। নিশ্চয়তা-অনিশ্চয়তা, প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির সংশয়ের দোলায় নিয়ত দোদুল্যমান মানব মন। মধ্যযুগের সীমাশাসনে এমন মঙ্গলবোধই জাগ্রত ছিল। ধনপতির বাণিজ্য যাত্রায় দর্পণ এবং চামর এসেছে স্বাভাবিকভাবে। দর্পণ মঙ্গল দ্রব্য। হিন্দু গৃহস্থের কাছে দর্পণ পবিত্র বস্তু। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘শুভ উৎসব’ প্রবন্ধে লিখেছেন – “আমাদের পুরাতন বিচিত্র উৎসবকলা যে ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাই। [.....] প্রাচীন কালে ইহার মধ্যে যে শুভ আনন্দটুকু ছিল, তাহা বুঝি আর থাকে না, [.....] একের উৎসব সাধারণের হইয়া সমধিক সরস ও সজীব হইয়া উঠিত, এবং বৃহৎ সমাজের সর্ব্বাঙ্গ একটি অখণ্ড সৌষ্ঠবলাভে সমাধিক মনোজ্ঞ সৌন্দর্য্যে প্রতিভাত হইত”।[১৪৫]

<u>সাঁজাকুড়া এবং মাজকুড়া -</u> কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ‘সাঁজাকুড়া’ এবং ‘মাজকুড়া’ এই দুটি লোকশিল্পের উল্লেখ আছে। ‘কুড়া’ অর্থাৎ কুণ্ড। ‘সাঁজাকুড়া’ হল ‘সংযুক্ত কুণ্ডের মত আসন’ আর ‘মাজকুড়া’ হল ‘মধ্য শিখর বিশিষ্ট আসন’। কবিকঙ্কণের কাব্যে কালকেতু দেবী চণ্ডীর কৃপায় অর্থলাভ করে গোলাহাট থেকে কিনেছেন ‘সাঁজাকুড়া’ এবং ‘মাজকুড়া’। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

“ কনকের সাঁজাকুড়া বিচিত্র পাটের গড়া

মাজকুড়া হিরায় জড়িত”।[১৪৬]

আবার দোলার সজ্জা প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"বরুণের সাঁজাকুড়া কনক আকুড়া

হিরামুখি নামে জায় চন্দনের পুড়া"। [১৪৭]

সোনা এবং হীরের অলংকার জড়িত এমন আসন একালে আর পাওয়া যায় না। মঙ্গল-আচার-অনুষ্ঠানে, পূজা-পার্বণে, উপবেশনে আসনের ব্যবহার হয়। বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণদের আসন দান করা হত। হিন্দু শাস্ত্রে আসনশুদ্ধির ব্যবস্থা ছিল। শাস্ত্রীয় ব্রতে আসন শুদ্ধি আবশ্যক। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে লিখেছেন – "শাস্ত্রীয় ব্রত : প্রথমে সামান্য কাণ্ড – যেমন আচমন, স্বস্তিবাচন, কর্মারম্ভ, সংকল্প, ঘট স্থাপন, পঞ্চগোব্যশোধন, শান্তিমন্ত্র, সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাসাদি এবং বিশেষার্ঘ্যস্থাপন। [....] সামান্যকাণ্ড এবং ব্রতকথা এই দুই হল পৌরাণিক ব্রতের উপাদান"। [১৪৮]

কমণ্ডল, করঙ্ক - কমণ্ডলু মাটির তৈরি বা কাঠের তৈরি জলপাত্র—'জল দ্বারা মণ্ডিত'। সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী ব্যবহার করেন এমন জলপাত্র। কুমোর বা ছুতোর সম্প্রদায়ের শিল্পীরা এমন পাত্র তৈরি করেন। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে কমণ্ডলুর উল্লেখ এসেছে। আখেটিক খণ্ডে দেবী চণ্ডীর কাঁচলিতে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা কমণ্ডলুর চিত্র অঙ্কন করেছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"দণ্ড কমণ্ডুল কুশ জটা শোভে চিত্র।

বামদেব জামদগ্নি লিখে বিশ্বমিত্র"। [১৪৯]

কালকেতুর গুজরাট নগরীতে বৈষ্ণবেরা বসেছেন, হরিনাম করছেন। তাদের হাতে কমণ্ডলু। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"কাঁথা কমণ্ডলু লাঠি   গলায় তুলসী কাঁঠি

সদাই গোঙায় গীত-নাটে"। [১৫০]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চৈতন্যবন্দনা অংশে সন্ন্যাসীরা করঙ্ক বা কমণ্ডলু নিয়ে দেশে দেশে ভ্রমণ করছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"তপ্ত কলধৌত-গৌর ভুবন লোচন-চৌর

করঙ্ক কৌপীন দণ্ড ধারী"। (১৫১)

কমণ্ডলু শুভসূচক, ব্রাহ্মণেরা প্রাচীনকালে রাজসূয় যজ্ঞে এবং দেবপূজায় কমণ্ডলু ব্যবহার করতেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে কমণ্ডলু হাতে ব্রাহ্মণেরা প্রবেশ করেছেন। মহাভারতকার লিখেছেন—

"কমণ্ডলুনুপাদায় জাতরূপময়ান্ শুভান্

ত্রৈখর্ব্বাঃ প্রতিবেদ্যাস্মৈ লেভিরেহথ প্রবেশনম্"। (১৫২)

শিকা - শিকার ব্যবহার প্রাচীনকাল থেকে। কবে প্রথম শিকা তৈরি হয়েছিল তা নির্ণয় করা কঠিন। মহাভারতে 'সভাপর্ব্ব'-এ কৃষ্ণ রত্ন বিভূষিত শিকার উপরে স্থাপিত স্বর্ণময় জলপাত্র যুধিষ্ঠিরকে উপহার দিয়েছিলেন। তা দেখে দুর্যোধনের জ্বর হয়েছিল। ব্যাসদেবের মহাভারতে উল্লিখিত আছে—

"শৈক্যং রুক্মসহস্রস্য বহুরত্নবিভূষিতম্।

শঙ্খপ্রবরমাদায় বাসুদেবোহঅভিষিক্তবান্

দৃষ্টা্ব চ মম তৎ সর্ব্বং জ্বররূপমিবাভবৎ"।। (১৫৩)

এমন নানা মণিরত্নখচিত শিকা (শিক্য) দেখে দুর্যোধন শকুনিকে বলেছিলেন যে, তাঁর জ্বর হয়ে গিয়েছিল। সেকালে রাজ অভিষেকের জল পূর্ব সমুদ্র এবং দক্ষিণ সমুদ্র থেকে অলংকৃত শিকায় কলসীতে ভরে নিয়ে আসা হত। শিকা সেকালের বাঙালি গেরস্থের প্রয়োজন এবং সৌন্দর্যের মিলিত শিল্পরূপ। খাবার সুরক্ষার জন্য বাড়ির ছাদ থেকে শিকা ঝুলিয়ে রাখা হত। ইঁদুর, বেড়াল এবং কীট পতঙ্গ থেকে খাদ্য দ্রব্য রক্ষার প্রয়োজনে লোকায়ত মানুষের উদ্ভাবনী, সৃজনী ভাবনার ফসল শিকা। শিকা তৈরির উপকরণ সামান্য। শাড়ির পাড়, পাট, দড়ি দিয়ে তৈরি হয় শিকা। খাবার দাবারের হাঁড়ি,

ছোট খাট ঘর-গৃহস্থালী দ্রব্যকে নিরাপদ স্থানে রাখার উপায় হল শিকা। সাধারণত ঘরের কড়ি কাঠ থেকে শিকাকে ঝুলিয়ে রাখা হত। শিকাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলা হয়। শিকার দড়িতে নানা ফুলের নকসা তৈরি করা হয়। আর শিকায় রাখা হাঁড়িগুলি পটুয়াদের নানা চিত্রে ভরপুর থাকত। সেকালে বিবাহের পূর্বে কন্যা নির্বাচনের সময়ে কন্যা শিকা তৈরিতে সিদ্ধহস্ত কিনা, তা দেখে নেওয়া হত। শিকা তৈরি করতেন প্রধানত রমণীরা। সেকালের সৌন্দর্য পিপাসু কলাবতী রমণীদের অন্তরের স্পর্শ লেগে থাকত শিকা শিল্পে। নির্লোভ ফুল্লরা কালকেতুকে চণ্ডীর মানিক অঙ্গুরি নিতে নিষেধ করেছেন। অপরের সম্পদের প্রতি লোভ নেই এই ব্যাধ রমণীর। দেবী চণ্ডী ফুল্লরার অভিলাষ বুঝেছেন। তিনি ফুল্লরাকে সামান্য ঘর-গেরস্থালীর শিকা উপহার দিয়েছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"অভয়া বলেন কালু লহ শিকা ভার

লহ খুড়ি কোদাল খন্তা খুরধার"।। [১৫৪]

শিকা শুধু ব্যবহারিক প্রয়োজন পূরণ করে নি, বাংলাদেশের শিকায় চমৎকার শিল্প সৌন্দর্য পরিলক্ষিত হয়। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎ বঙ্গ' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে লিখেছেন—"বাঙ্গালার নানাস্থানে শিকার মধ্যে শুধু ফুল, লতা, পল্লব নহে, রাধাকৃষ্ণ ও অপর দেবদেবীর মূর্ত্তি সূতা দিয়া নির্ম্মিত হয়—তাহাও বিশেষভাবে দর্শনীয়। সুতরাং দেখা যায় পূর্ব্বযুগের মেয়েদের প্রত্যেকে এক একটি কলা-লক্ষ্মী ছিলেন। মেয়েলী শিল্প বাঙ্গলাদেশে এককালে যতটা বিকাশ লাভ করিয়াছিল, অন্য কোন দেশে এত দিক্ দিয়া তাহা বিকাশ পাইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। বাঙ্গলার "শিকে যাহাতে কৌটা, ভাঁড়, হাঁড়ি, জলপাত্র ও পানের বাটা প্রভৃতি ঝুলাইয়া রাখা হয়, তাহার মধ্যে নারীহস্তের কমনীয় শিল্প যে কত প্রাচীন রীতির পরিচায়ক তাহা বলিতে পারি না"। [১৫৫]

<u>কলম</u> - কলম তৈরি হত 'শর' বা 'নল' থেকে। প্রাচীনকালে কলম্ব বা 'শাক নালিকা' (ডাঁটা) থেকে কলম তৈরি হত। 'শর', 'খাক', 'কঞ্চির কলম' সবই নালিকা বিশেষ। লেখার জন্য এমন কলম ব্যবহৃত হত। মধ্যযুগে একসময় ধূর্ত মসীজীবী সম্প্রদায়ের জন্ম হয়েছিল। কবিকঙ্কণ মসীজীবী সম্প্রদায়ের স্বভাবসিদ্ধ ধূর্ততার পরিচয় রেখে

গেছেন। কাব্যে ভাঁড়ুদত্ত কলম কানে তাঁর চতুরতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রাচীনকালে পালকের কলমও ব্যবহার হত। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"হরি শ্রুতি করিয়া কলম গোঁজে কানে"। (১৫৬)

ভাঁড়ু দত্ত রাজ দর্শনে যাচ্ছেন। কপালে তিলক কেটেছেন। নিয়েছেন পাঁজি, কানে তার কলম গোঁজা। রাজ উপঢৌকন স্বরূপ নিয়েছেন কাঁচকলা, পুঁইশাক এবং কলার মোচা। ধূর্ত ভাঁড়ু দত্তের এ এক নবরূপ। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' গ্রন্থে লিখেছেন—'কায়স্থের কৌলিন্যগর্ব ও নেতৃত্বস্পহা যেন ব্রাহ্মণকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। মসীজীবি-সম্প্রদায়ের স্বভাবসিদ্ধ ধূর্ততা প্রথম কায়স্থের মধ্যেই স্ফূর্ত হইয়াছে'। (১৫৭)

শয্যা - গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ তাঁর 'প্রাচীন শিল্প পরিচয়' গ্রন্থে শয্যাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 'শয্যা' রাজ উপকরণ। মহারাজ ভোজের যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থের অনুসারী আলোচনা করেছেন বেদান্ততীর্থ মহাশয় তাঁর গ্রন্থে। শয্যার আধার খট্টা বা খাট। প্রাচীনকালে রাজা, রাজপুত্র, মন্ত্রী, সেনাপতি, পুরোহিত এবং দৈবজ্ঞের পৃথক পৃথক আকৃতির শয্যা ছিল। শ্রীপর্ণী, শাল, চন্দন প্রভৃতি কাঠ দিয়ে শয্যা তৈরি হত। এই সব কাঠ শয্যার পক্ষে শুভকর বিবেচিত। এরপর শয্যাকে গজদন্ত এবং অলংকারে অলংকৃত করা হত। প্রাচীন গ্রন্থে শয়ন শয্যা, স্ত্রী-সম্ভোগ শয্যা এবং পুষ্প শয্যার উল্লেখ আছে। গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ তাঁর 'প্রাচীন শিল্প পরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন—"ঋতুভেদে এবং অনুরক্ত, বিরক্ত ও মধ্যস্থ (যে অনুরক্তও নয়, বিরক্তও নয়) এই তিন প্রকার লোকের অভিপ্রায়ানুসারে এবং আহারের পরিণামবিশেষানুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শয্যারচনার কৌশল উদ্‌ভাবিত হইয়াছিল। গ্রীষ্মঋতুতে ব্যবহার্য শয্যা বর্ষাঋতুতে বা শীতঋতুতে সুখপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না, সুতরাং সমৃদ্ধ মানবের পক্ষে ঋতুভেদে সুখকর বিভিন্ন শয্যারচনার প্রণালী শিল্পীদিগের চিন্তার বিষয় হইয়াছিল"। (১৫৮)

মধ্যযুগে বিবাহে জামাতাকে যৌতুক স্বরূপ শয্যা দেওয়ার রীতি ছিল। বণিক খণ্ডে সিংহলরাজ শ্রীমন্তকে যৌতুক দিয়েছেন শয্যা। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"শয্যা ঝারি ধেনু থালা রথ গজ ঘোড়া দোলা

দিআ জামাতার কৈল মান"। (১৫৯)

মধ্যযুগে পণপ্রথা এক বিশিষ্ট রূপ নিয়েছিল। পণকে জামাতার সম্মান স্বরূপ দেখা হত। সেকালে পণের পরিমান কম ছিল না। কন্যা সম্প্রদানকালে জামাতাকে নানা উপঢৌকন স্বরূপ পণ দেওয়া হত। শ্রীমন্তকে সিংহলরাজ উপঢৌকন স্বরূপ দিয়েছেন শয্যা, ঝারি, ধেনু, থালা, রথ, গজ, ঘোড়া এবং দোলনা। অবশ্য রাজকন্যার বিবাহের যৌতুকেই বোঝা যায় পণের আড়ম্বরতা। এক সময়ের সামাজিক অবস্থা প্রতিফলিত হয়েছে কবিকঙ্কণের কাব্যে।

পাটা - পাটা অর্থাৎ পীঠ বা আসন। কাষ্ঠফলক বা তক্তা বা 'পুঁথির কাষ্ঠবরণ' হল পাটা। গাম্ভারী, পনস, চন্দন এবং বকুল কাঠের পীঠের ব্যবহার আছে। কবিকঙ্কণের কাব্যে পাটার উল্লেখ রয়েছে। কালকেতু জঙ্গল কেটে গুজরাট নগর পত্তন করেছেন। প্রজাবসতি হয়েছে নগরে। কালকেতু কৃষকদের আহ্বান করেছেন। বুলান মণ্ডলকে নগরে বাস করার পরামর্শ দিয়েছেন। আর কৃষক বুলান মণ্ডলকে বলেছেন জমিতে চাষ করার। সাত সাল চাষ করার পর কর দিতে বলেছেন। আর পুঁথির পাটায় হিসেবের প্রমাণ রাখতে বলেছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"হাল পীছে এক তঙ্কা না করিহ কারে শঙ্কা

পাটায় নিসান মোর ধর"। (১৬০)

তক্ষণশিল্পের এক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন পীঠ। সমগ্র মধ্যযুগে পীঠ এক গুরুত্বপূর্ণ মঙ্গল দ্রব্য। পাটা বা পীঠ আসন বিশেষ। মূর্তির পাদপীঠে লিপি খোদিত থাকত। শ্রীস্বদেশরঞ্জন চক্রবর্তী তাঁর "প্রাচীন বাঙ্গালার ভাস্কর্যবিজ্ঞান ও তক্ষণ-শিল্প" প্রবন্ধে বাসুদেব মূর্তির পাদপীঠে লিপি খোদাইয়ের উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন— "কুমারষাণ্ডা গ্রামে গঙ্গামূর্তির পাদপীঠে একটি মকর রহিয়াছে"। (১৬১)

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতু বুলান মণ্ডলকে পুঁথির পাটায় (পীঠে) চাষের আয় ব্যয়ের হিসেব রাখতে বলেছেন। সেকালে কাঠ খোদাই করে পুঁথি চিত্রিত করা হত। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'খোদাই-চিত্রে বাঙালি' প্রবন্ধে লিখেছেন—"আমি গত কয়েক বৎসর যাবৎ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ ও বাংলা সাহিত্য লইয়া কাজ

করিতে করিতে সেকালের কতকগুলি চিত্রিত পুস্তকের সন্ধান পাইয়াছি। এগুলিতে কাঠ এবং ধাতু উভয় ধরনের খোদাই-চিত্রই আছে"।[১৬২]

<u>ময়ূর পাখার শিল্প</u> - ময়ুর পুচ্ছ দৃষ্টিনন্দন। লোকশিল্পী ময়ূর পালক দিয়ে নানা রূপসন্ধানী শিল্প তৈরি করেন। কৃষ্ণের মাথায় শোভিত হত ময়ূর পুচ্ছের চূড়া। সুদূর মধ্যযুগের কবি মুকুন্দরামের কাব্যে ময়ূর পালকের অলংকারের বর্ণনা আছে। হরগৌরী গঙ্গায় নৌকা সাজিয়ে কৃষ্ণকথা শুনছেন। কৃষ্ণের রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"গলে শোভে গুঞ্জমাল শিরে শিখিপুচ্ছজাল

গৌর রঞ্জিত কলেবর"।[১৬৩]

শ্রীমন্ত সিংহলদেশে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। সঙ্গে নিয়েছেন নানা উপঢৌকন। রাজাকে দিয়েছেন বাংলা দেশের নানা লোকশিল্প সামগ্রী। বাংলার লোকশিল্পের স্বপ্নপুরী নির্মাণ করেছেন কবিকঙ্কণ। কবির বর্ণনা এরকম—

"উপরে ছাওনি দিল পাটের পাছড়া

চারিদিকে শোভে গজমুকুতার ঝারা

ময়ূরপাখের তায় লাগিছে ছাওনি

বেনন পাটের থোপ রসের দাপনি"।[১৬৪]

শিল্প সৌন্দর্যকে বর্ণনায় ধরা যায় না। তা একান্তই অনুভূতির। লোকশিল্পী তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপকরণ সহযোগে এমন দৃষ্টিনন্দন শিল্পবস্তু নির্মাণ করেন যে, তা চিরকালীন সৌন্দর্যের সারাৎসার হয়ে থাকে। দোলার সাজের বর্ণনা দিয়েছেন মুকুন্দরাম। 'সাজাকুড়া', 'কনক আকুড়া', 'চন্দনের পুড়া', 'পাটের পাছড়া', 'গজমুকুতার ঝারা', 'ময়ূর পাখার ছাউনি', 'পাটের থোপ' এসব উপকরণে তৈরি করছেন সওদাগরের দোলা। শিল্প সৌন্দর্যের জ্যোতি-তা কেবলই অনুভূতির।

পুটলি, থলি - ঠাকুমার ঝুলির থলি, পুটলি বাঙালিকে দূর রূপকথার জগতে নিয়ে যায়। কাপড়ের তৈরি পুটলি নানা ফুল, লতা পাতার চিত্র-নকসা শোভিত। সামান্য প্রয়োজনীয় গৃহস্থালী এই দ্রব্যটি নানা কারুকার্য ও অলংকারে শোভিত। বাঙালি রমণীর সৌন্দর্য সন্ধানী চিত্ত নানা অলংকারের বিন্যাসে এমন পুটলিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। পুটলিতে সূচিশিল্পের চিরন্তনী চিহ্ন রেখে দেন বাঙালি রমণীরা। পুটলিতে নানা জিনিসপত্র রেখে ব্যবহারেরও উপযোগী করেন বাঙালি রমণীরা। মুকুন্দরাম এমন পুটলির উল্লেখ করেছেন তাঁর কাব্যে। নিজে ব্রাহ্মণ হয়েও আশ্চর্য নিরপেক্ষ-নিরাসক্তির পরিচয় দিয়েছেন কবিকঙ্কণ। কবি লিখেছেন—

"মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে
শিখিআ পূজার অনুষ্ঠান
চন্দন তিলক পরে দেব পূজে ঘরে ঘরে
চালের পুটলী বান্ধে টান"।[১৬৫]

আবার মালীরা এভাবেই ফুলের পুটলি বাঁধেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"মালী বৈসে গুজরাটে মালঞ্চে সদাই খাটে
মালা মউড় গড়ে ফুলঘর
ফুলের পুটলি বান্ধে সাজি দণ্ড করি কান্ধে
ফিরে তারা নগরে নগর"।[১৬৬]

সেকালে বিবাহের যৌতুক স্বরূপ সর্ষের পুটলি, সরা, সুতা ও নাটাই দেওয়া হত। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

সর্ষব পুটলি ভরা বান্ধ্যা নিল কোল সরা
সুতা, নিল নাটাই সহিত"।[১৬৭]

একথা ঠিক, সামান্য তুচ্ছ সামগ্রীর মধ্যে বাঙালিরা তাদের শিল্পকর্ম ফুটিয়ে তুলতেন। প্রকৃতপক্ষে লোকশিল্প বাঙালির জীবনের সঙ্গে যুক্ত। শিল্পের সঙ্গে বাঙালির নাড়ীর সম্পর্ক। কমলকুমার মজুমদার তাঁর 'বঙ্গীয় শিল্পধারা ও অন্যান্য প্রবন্ধ' গ্রন্থে যথার্থই লিখেছেন—"বাঙলা দেশ শিল্পকে কোন নামেই জীবন হইতে বাদ দেয় নাই। সমস্ত সময় শিল্পকে আলিঙ্গন করিয়াছিল। এমনভাবে থাকা তখনই সম্ভব যখন তাহার মধ্যে কিছু বাস্তবতা থাকে এবং সেই বাস্তবতা তাহাকে রাত্রদিন আনন্দ দেয়"।[১৬৮]

প্রসাধনী - গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ তাঁর 'প্রাচীন শিল্প পরিচয়' গ্রন্থে 'প্রসাধনী'কে স্থান দিয়েছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন- "প্রসাধনী নামের বুৎপত্তিলভ্য অর্থানুসারে উহার বিলাসোপকরণতা বুঝিতে পারা যায়। প্রসাধন বা সাজা-গোজা যাহার দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাহা প্রসাধনী। [......] সূর্য প্রভৃতি গ্রহের দশাজাত রাজাদিগের জন্য যথাক্রমে স্বর্ণ, রূপা, তাম্র, পিত্তল, সীস, লৌহ এবং মিলিত সমস্ত ধাতু, ইহাদের দ্বারা প্রসাধনী প্রস্তুত করিতে হয়। মৃগশৃঙ্গ মহিষশৃঙ্গ নির্মিত প্রসাধনী 'কালকীর্তি' নামে অভিহিত। এই প্রসাধনী এবং গজদন্ত নির্মিত প্রসাধনী কেবল রাজাদিগেরই ব্যবহার্য। প্রসাধনীতে চামরদণ্ডের রীতি অনুসারে রত্নবিন্যাস করিতে হয়। --"তত্রাপি রত্নবিন্যাসো জ্ঞেয়শ্চামরদণ্ডবৎ"।[১৬৯]

প্রসাধনীর অন্যতম হল চিরুনী বা কাঁকুই বা কঙ্কতিকা। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে খুল্লনার নানা প্রসাধনী দ্রব্যের উল্লেখ করেছেন কবি। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—'দ্রঢ়বন্ধন দড়ি', 'তসরের সাড়ি', 'চিরুনি বা প্রসাধনী', 'হেমদণ্ড রসের দাপনি', 'কুসুমের গাভা', 'কনক বউলি', 'কনক কেয়ূর', 'নূপুর', 'কিঙ্কিণী', 'যাবকের রস', 'দর্পণ', 'রজতের ঝারি', 'নারায়ণ-তৈল', 'মল্লিকার মালা' প্রভৃতি। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"মানিক ভাণ্ডাত্র আনে অভরণ পেড়ি।/অবধানে আল্বাইল দ্রঢ়বন্ধন দড়ি

দোছাট করিআ পরে তসরের সাড়ি।/দুবলা মাঞ্জএ কেশ লয়্যা প্রসাধনি

বাম করে হেমদণ্ড রসের দাপনি।/কবরী বান্ধিল রামা কুসুমের গাভা

শ্রবণ উপরে পরে কনক-বউলি/[......]বাহুযুগে আরোপিল কনক কেয়ূর

কাঞ্চনে গঠিত পরে বাজন-নূপুর।/[......] মণিবিরাজিত পরে মুখর কিঙ্কনী

[......] যাবকের রসে করে অধর মাজন/[......] রসের দর্পণ তুল্যা নেহালে বদন।

ডানি করে নিল রামা রজতের ঝারি/বাম করে নারায়ণ-তৈলে পুর্যা খুরি।

করবীতে আরোপিল মল্লিকার মালে”।(১৭০)

আবার লহনার রূপসজ্জায় যে সব প্রসাধনীর উল্লেখ এসেছে, সেগুলি হল ‘আভরণ পেড়ি’, ‘চিরুনি বা প্রসাধনী’, ‘হেমদণ্ড রসের দাপনি’, ‘দর্পণ’, ‘মেঘডম্বুর কাপড়’, ‘অঞ্জন’, ‘সিন্দুর’, ‘মণিকর্ণপুর’, ‘হার’, ‘কাঁচলি’, ‘ঔষধ’ এবং ‘কর্পুর’ প্রভৃতি। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম লিখেছেন -

“মানিক ভাণ্ডারে আনে অভরণ পেড়ি।/দুবলা মার্জএ কেশ লয্যা প্রসাধ্বনি

বাম করে হেমদণ্ড রসের দাপনি।/ আঁচড়িল কেশভার নানা পরিবন্ধে

তৈলজুত হইআ পড়ে লহনার কন্ধে।/করবী বান্ধিল রামা নামে শুয়াঠুটী

দর্পণে নেহালি দেখে জেন গুয়াগুটি।/মাছ্যাতা দেখিআ মুখে দর্পণে চাপড়

বাছিআ পরত্র মেঘডম্বুর কাপড়।/জতনে পরত্র রামা অঞ্জন সিন্দুর

মার্জন করিআ পরে মণিকর্ণপুর।/কমরে দোয়াল বান্ধি হইল ঋজুকায়

মণিময় হার কুচযুগলে লোটায়।/বসনে তুলিআ রামা বান্ধে পয়োধর

মোহন কাঁচালি পরে তাহার উপর।/[......] নানা ঔষধ রামা মাখিআ কর্পূরে”।(১৭১)

মধ্যযুগে প্রসাধনীর সাহায্যে কিভাবে রূপচর্চা করা হত, তাঁর একটি নিটোল বর্ণনা দিয়েছেন কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম। অভিজাত বণিক সসমাজের রমণীরা সেকালেই যে শীলিত জীবনচর্যার অধিকারী ছিলেন, তার একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়, লহনা এবং খুল্লনার রূপচর্চায়। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘প্রাচ্য প্রসাধনকলা’ প্রবন্ধে লিখেছেন— “সেকালের প্রসাধনকলায় তবে না জানি কি মোহ ছিল, যাহাতে কবিহৃদয় আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিত না। [......] প্রাচ্য প্রসাধনকলার এই যে একটি নিরুদ্বেগ সহজ গার্হস্থ্য ভাব, ইহাতেই ইহা রমণীয় এবং এই ভাবের গুণেই কবিহৃদয়ে ইহা এমন সহজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। আমাদের মনে আমাদের প্রমদাগণের চিত্র যেন তাঁহাদের

বিচিত্র প্রসাধনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সন্নিবদ্ধ। সিন্দুরের টিপটি, কবরীর বেষ্টনটি, অঞ্চলের প্রান্তটি, অবগুণ্ঠনের পাড়টি, দুইখানি প্রকোষ্ঠসন্নদ্ধ বলয়কঙ্কণ এবং কণ্ঠবিলম্বিত চারুহারলতাটি, এমনকি, নূপুরের নিক্কনটুকু পর্য্যন্ত আমাদের অন্তরে কুলকন্যাগণের কমনীয় মূর্ত্তির সহিত একান্ত বিজড়িত”।[১৭২]

ভৃঙ্গার (জলপাত্র) - ভৃঙ্গার জলপাত্র বিশেষ। মাটির তৈরি। মাটি ছাড়াও সোনা, রূপা, তামা, স্ফটিক, কাঠ, লোহা এবং পশুর শৃঙ্গ নির্মিত হয়। রাজার নয়টি উপকরণের মধ্যে ভোজরাজ ভৃঙ্গারকে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী করেছেন। প্রাচীনকালে ভৃঙ্গার রাজার অভিষেকপাত্র রূপে বিবেচিত হত। কেবল মাটির ভৃঙ্গারে মণি সংযোগ করা যেত না। বাকি সাত প্রকারের ভৃঙ্গারে পদ্মরাগমণি, হীরক, বৈদূর্য, মৌক্তিক, নীলমণি, মুক্তা প্রভৃতি মণি সংযোগ করা হয়। স্বর্ণভৃঙ্গার কেবল রাজা ব্যবহার করতেন, আর কোন ব্যক্তির সে অধিকার ছিল না। ভৃঙ্গারে চিত্রকলার অঙ্কন করা হত। শঙ্খ, পদ্ম, চন্দ্র—এই প্রতীক চিহ্নগুলি ভৃঙ্গারে সংযুক্ত করা হত। গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ তাঁর ‘প্রাচীন শিল্প পরিচয়’ গ্রন্থের ‘ভৃঙ্গার’ অংশে লিখেছেন—“ভোজ-রাজ উহাকে নৃপতিদিগের অভিষেকপাত্র নামেই অভিহিত করিয়াছেন—‘রাজ্ঞোঽভিষেকপাত্রং যদ্ ভৃঙ্গার ইতিতন্মতম্’ [......] সাধারণে মৃন্ময় ভৃঙ্গার ব্যবহার করিবে।----

“কানকস্তু ক্ষিতীশানাং মৃন্ময়ং সার্বযৌগিকম্”

ভৃঙ্গার রাজাভিষেকের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইলেও, অন্যান্য কাজের সহিত উহার সম্পর্কের অভাব নাই। দুর্গাপূজার মহাস্নানে ভৃঙ্গারের ব্যবহার আছে। বর্তমানকালে অভিধান প্রভৃতিতে ভৃঙ্গার গাড়ু বা ঝারি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বৈধকার্যেও গাড়ুর দ্বারাই ভৃঙ্গারের প্রয়োজন সম্পন্ন হইতে দেখা যায়”।[১৭৩]

আর একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, সেকালে হরিণ, মহিষ প্রভৃতি পশুর শৃঙ্গ দিয়ে ভৃঙ্গার তৈরি করা হত। অন্যান্য ধাতুর মতই পশুর শৃঙ্গকে তাপ দিয়ে নরম করে বা গলিয়ে ভৃঙ্গার প্রস্তুত করা হত। স্বাভাবিকভাবে বোঝা যায়, প্রাচীনকালেই পশুশৃঙ্গকে গলিয়ে শিল্পরূপ দেওয়ার কৌশল শিল্পী আয়ত্ত করেছিল। ঋষিরাও ভৃঙ্গার ব্যবহার করতেন। এসব ক্ষেত্রে বেদ এবং তন্ত্রের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের ভারতবর্ষের শিল্প শাস্ত্রের প্রথম নিয়ন্ত্রণ করেছিল সুপ্রাচীন বেদ ও তন্ত্র শাস্ত্র।

কবিকঙ্কণ মকুন্দরামের কাব্যে ভৃঙ্গারের উল্লেখ এসেছে। লহনা সৌন্দর্য চর্চা করছেন। অভিজাত বণিক রমণী লহনা। রূপসজ্জা তাঁর সহজাত। সৌন্দর্যচর্চার উপকরণ রূপে তিনি ব্যবহার করেছেন ভৃঙ্গার। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী লিখেছেন—

"লহনা বিকল্প পানি পুরিআ ভৃঙ্গারে

নানা ঔষধ রামা মাখিআ কর্পূরে"।[১৭৪]

সপত্নী খুল্লনার যথার্থ প্রতিযোগিনী হয়ে উঠেছেন লহনা। একটি যুগকে বিস্মৃতপ্রায় হয়ে গেছি আমরা। মধ্যযুগের ব্যবহৃত ভৃঙ্গার একালে আর সাধারণে সেভাবে কেউ ব্যবহার করে না।

<u>সাঁপুড়া (হাতবাক্স)</u> - সেকালে টাকা-পয়সা, দলিল দস্তাবেজ এবং অলংকার সামগ্রী রাখা হত ছোটো হাত বাক্সের মধ্যে। একালের মত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা তখনও গড়ে ওঠে নি। সাধারণত কাঠ, লোহা প্রভৃতিতে নির্মিত হত এমন হাত বাক্স। ছোট হাত বাক্স সোনা বা রূপা দিয়েও তৈরি হত। ছুতোর, কামার, কাঁসারি বা স্বর্ণকার সম্প্রদায়ের লোকশিল্পীরা এমন হাত বাক্স তৈরি করতেন। এরকম হাত বাক্স. চমৎকার কারুকার্য মণ্ডিত হত। নানা নকসা দিয়ে অলংকৃত করতেন শিল্পীরা। শিল্পীর হৃদয়ের স্পর্শ লেগে থাকত তাদের শিল্প কর্মে। বাঙালির গৃহকোণে সৌন্দর্যের স্মারক রূপেই বিরাজ করত এমন হাতবাক্স।

কবিকঙ্কণের কাব্যে 'সাঁপুড়া' বা হাতবাক্সের উল্লেখ এসেছে। দেবী চণ্ডীর কৃপায় অর্থলাভ করে কালকেতু গোলাহাট থেকে কিনেছেন হাতবাক্স—

"নম্রমান মুতিআর   অঙ্গদ কঙ্কণ হার

কিনে বীর কনক সাঁপুড়া"।[১৭৫]

অর্থনীতি জীবন যাত্রার মানের পরিবর্তনের সূচক। কালকেতুও আদিবাসী অনার্য সংস্কৃতি থেকে শীলিত সংস্কৃতির অংশীদার হতে চেয়েছেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি সমাজ পরিবর্তনের সূচক রেখে গেছেন তাঁর কাব্যে। অর্থনীতি যে ব্যক্তির সামাজিক মান নির্ধারণের সূচক কালকেতুর জীবনের দুই পৃথক সত্তায় তার পরিচয় স্পষ্ট। হাত বাক্স

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার চমৎকার দারু ভাস্কর্য। দারুশিল্পী গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত এমন শিল্পে সৌন্দর্য বর্ধন করেন। নানা চিত্র-ভাস্কর্য শোভিত এমন একটি হাত বাক্সের নিদর্শন শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'দারুশিল্প' প্রবন্ধে রেখে গেছেন। শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর "দারুশিল্প" প্রবন্ধে লিখেছেন—"কাষ্ঠে খোদাই কাজ দারুশিল্পের একটি অঙ্গ। [.....] এই প্রকার কারুকার্যে শিল্পীর হস্ত-কৌশল, পরিকল্পনা এবং সামঞ্জস্য-জ্ঞান, তিনটি সমান থাকা উচিত"।[১৭৬]

টুপী- কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কাব্যে ধার্মিক মুসলমানদের নমাজ পড়ার সময়ে ব্যবহৃত টুপীর উল্লেখ আছে। কালকেতু দেবী চণ্ডীর কৃপায় অর্থলাভ করেছেন। জঙ্গল কেটে গুজরাট নগরে প্রজাবসতি গড়েছেন। এসেছেন ধার্মিক মুসলমানেরা। তারা টুপী মাথায় দিয়ে নমাজ পড়ছেন—

"পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।

....

প্রাণ গেলে রোজা নাহী ছাড়ি।

....

না ছাড়ে আপন পথে সদাই টুপী দেই মাথে

ইজার পরয়ে দড় নাড়ি"।[১৭৭]

যুগ-সমাজ-সময়-পরিবেশ অনুযায়ী লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্য বদল হয়। মধ্যযুগের সেই গ্রাম নির্ভর পল্লী পরিবেশ একালে আর নেই। ইংরেজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির প্রভাব এসে পড়েছে বাংলার গ্রামজীবনে। দেশীয় শিল্পের সর্বনাশ সাধিত হয়েছে। বাংলার কুটির শিল্প এবং গৃহশিল্পে স্বাভাবিকভাবে যন্ত্রসভ্যতার প্রভাব পড়েছে। বহুজাতিক কোম্পানীর কারখানা ঘরে উৎপাদিত দ্রব্য মধ্যযুগের লোকশিল্পে সেই পুরাতনী শিল্পরীতিকে বিনষ্ট করেছে। গৃহশিল্পের ধরন ধারণও বদলেছে। কৃষি নির্ভর পল্লী পরিবেশে একান্ত প্রাকৃতজ উপাদানে তৈরি লোকশিল্পের অবশেষ ঘোষণা হচ্ছে ক্রমে ক্রমে। সেকালের সেই বৃত্তি এবং সম্প্রদায় গেছে ভেঙে। ঐতিহ্য-

উত্তরাধিকার এবং অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ শিল্পীরা একালে আর নেই। গৃহশিল্পে ব্যবহৃত সেই পুরাতনী কালের রীতিনীতি, বিশ্বাস-সংস্কার, ট্যাবু, আচার-আচরণকে একালে মান্যতা দেওয়া হয় না। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লিখিত গৃহশিল্প একান্তই মধ্যযুগীয়। প্রয়োজন এবং সৌন্দর্যের মেলবন্ধন ছিল সেই শিল্পে। মোটিফ চিত্রকলা এবং সৌন্দর্যে ভরপুর ছিল সেই শিল্প। একটি বিশিষ্ট যুগের বিনষ্টি ঘটে গেছে কবে কবে, ধীরে ধীরে-ধাপে ধাপে।

তথ্যসূত্র

১. বেদান্ততীর্থ, গিরীশচন্দ্র, প্রাচীন শিল্প পরিচয়, ভূমিকা – অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ: ১৩

২. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৫৪

৩. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩

৪. পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৭

৫. পূর্বোক্ত, পৃ: ১২৫

৬. Russell, R.V., The Tribes and Castes of The Central Provinces of India, Volume I, CPSIA, www.ICGtesting.com, Printed in the USA, BVHW0IS0830231018 530990 BV000053B/41/P, PP. – CCLXI & CCLXII

৭. বেদান্ততীর্থ, গিরীশচন্দ্র, প্রাচীন শিল্প পরিচয়, ভূমিকা – অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ: ১৫৫

৮. চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসত্যকিঙ্কর, প্রাচীন বাংলা কাব্যে কুটিরশিল্প, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৫৭, পৃ: ৩৫০, সম্পা. কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃ: ৩৫০

৯. বেদান্ততীর্থ, গিরীশচন্দ্র, প্রাচীন শিল্প পরিচয়, ভূমিকা – অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ: ১৫৭, ১৫৮

১০. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৫৭

১১. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩

১২. পূর্বোক্ত, পৃ: ১০৪

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ: ১০৩

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ: ১১৪

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৫৩

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৮১

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ: ১২৪

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ: ৩০৩

১৯. সিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য, শ্রীহরিদাস, স্মৃতিচিন্তামণি:, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪২৫, পৃ: ৭৯

২০. বাল্মীকি, শ্রীম্মহর্ষি, রামায়ণম্, পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.) বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০১২, সুন্দরাকাণ্ড: প্রথম সর্গ, পৃ: ৭১২

২১. পূর্বোক্ত, পৃ: ৭১২

২২. ভোজ, যুক্তিকল্পতরু, প্রাচীন শিল্প পরিচয়, গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ: ১৪২৫, পৃ: ১৫৯

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৬২

২৪. Cirlot, J.E, A Dictionary of Symbols, Second Edition, Translated from the Spanish by Jack Sage, London, Routledge and Kegon Paul Ltd. 1962, 2^{nd} Edition – 1971, P. 10

২৫. Zimmer, Heinrich, Myths and Symbols in Indian Art and Civilization, Edited by Joshep Compbell, New York City 1945, 1946, Renewed 1973 by Princeton University press, reprint Motilal Banarsidass Publishers Private Ltd., Delhi, 2015, P. 72

২৬. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩,

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৬

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৮

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৭২

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৯৬

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ: ২২৯

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৩০

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৯৭

৩৪. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ, প্রাচীন বাংলার গৌরব, সম্পা. – জিশান হাবিব, পত্রলেখা, এপ্রিল – ২০১৭, কলকাতা, পৃ: ৪১

৩৫. জানা, রঙ্গনকান্তি, পশ্চিমবঙ্গের লৌকিক জলযান, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মে, ২০০৯, পৃ: ৩১,৩২

৩৬. জসীমউদ্দীন, চৌধুরীদের রথ, জসীমউদ্দীন রচনা সমগ্র, কাকলি প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারী-২০১৭, পৃ: ৭৮

৩৭. পূর্বোক্ত, ধামরাই রথ, পৃ: ১৯৩, ১৯৪

৩৮. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ: ৮

৪০. পূর্বোক্ত, পৃ: ৯

৪১. পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৮

৪২. পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৮

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ: ১০৮

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ: ১১২

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৪৪

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৭৮

৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ: ২১৮

৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৪৩

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৪৮

৫০. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৬৪

৫১. তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পা.), দেবী পুরাণম্, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা , পুনর্মুদ্রণ- ১৪১৬, পৃ: ১৭৫

৫২. ঋগ্বেদ সংহিতা (মূল), ৬ মণ্ডল, ৪৪ সূক্ত, ।।১৯।।, রমেশচন্দ্র দত্ত সংকলিত ও অনূদিত, নিমাইচন্দ্র পাল (সম্পা.), সদেশ, কলকাতা, ২০০৭, পৃ: ৩৫৯

৫৩. বাল্মীকি, শ্রীমম্মহর্ষি, রামায়ণম্: (অযোধ্যাকাণ্ড),সম্পা.- শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরী, কলকাতা, মে – ২০১২, পৃঃ ৩৩৯, ৩৪০

৫৪. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩,

৫৫. পূর্বোক্ত, আখেটিক খণ্ড, পৃ: ৮৭

৫৬. পূর্বোক্ত, আখেটিক খণ্ড, পৃ: ২৮৭

৫৭. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৬

৫৮. সেন, অতুলচন্দ্র ও তত্ত্বভূষণ, সীতানাথ এবং ঘোষ, মহেশচন্দ্র (সম্পা.), উপনিষদ: তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ১ম অধ্যায়, ১১শ অনুবাদ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারী – ১৯৯৪, পৃ: ২৮৬

৫৯. Mookerjee, Ajit, Folk Art of India, India Library, Clarion Books, New Delhi, 1986, P. 116

৬০. সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, শ্রীহরিদাস, স্মৃতিচিন্তামণি:, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪২৫, অক্ষয় তৃতীয়া, পৃ: ১৩৬

৬১. হাজরা , প্রবালকান্তি, গ্রামীণ জীবন রাগের ঝিলিক, প্রভা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৮, পৃ: ৫৬

৬২. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, বঙ্গীয় শব্দকোষ, প্রথম খণ্ড ।। অ-ন, সাহিত্য অকাদেমি, ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০০৪, নতুন দিল্লি, পৃ: ৫২১

৬৩. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩,

৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৩

৬৫. পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৪

৬৬. মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅজিতকুমার, জাতীয় জীবনে ঠাকুরমার দান, প্রবাসী, কার্তিক – ১৩৪০, পৃ: ১০৩, সম্পা. – রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৬৭. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ৬৭

৬৮. গুপ্ত, বিজয়, মনসামঙ্গল, বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ: ১৩১

৬৯. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ৩

৭০. পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৫

৭১. দাস, বাণী, বেতশিল্প (প্রবন্ধ), লোকজ শিল্প (গ্রন্থ), সম্পা. – বরুণকুমার চক্রবর্তী, পারুল প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ – ২০১১, পৃ: ১২৭, ১২৮

৭২. Harrison, Jane Ellen (LL.D., D. Litt), Ancient Art and Ritual, Williams and Norgate Henry Holt and Co., New York, London, 1913, P. 128

৭৩. চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার,বঙ্গের অন্তঃপুরশিল্প, প্রাবাসী, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩২৯, পৃ: ৬৮৬, সম্পা. – রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৭৪. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ৮০

৭৫. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৬

৭৬. পূর্বোক্ত, পৃ: ৭৯

৭৭. Chevalier, Jean and Gheerbrant Alain, Dictionary of Symbols (Lamp), Penguin Books, 1986, P. 589

৭৮. বেদান্ততীর্থ, গিরীশচন্দ্র, প্রাচীন শিল্প পরিচয়, ভূমিকা – অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ।দ্বিতীয় মুদ্রণ – ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ: ৩৪, ৩৫

৭৯. মহাভারতঃ সভাপর্ব্ব : ৫৩/৩৬, ‘প্রাচীন শিল্প পরিচয়’- গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। বেদান্ততীর্থ, গিরীশচন্দ্র, সুবর্ণরেখা, কুথ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ – ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ: ৩৪

৮০. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ১৭৯

৮১. ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ, চুলবাঁধা (কবিতা), শ্রাবণী (কাব্যগ্রন্থ), বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, সম্পা. – ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয়- সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, মাঘ – ১৪২২, পৃ: ৬১

৮২. Mookerjee, Ajit, Folk Art of India, India Library, Calrion Books, New Delhi, 1986, Introduction, P. 14

৮৩. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩

৮৪. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৭

৮৫. পূর্বোক্ত, পৃ: ১১৯

৮৬. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৩১

৮৭. বেদান্ততীর্থ, গিরীশচন্দ্র, প্রাচীন শিল্প পরিচয়, ভূমিকা – অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ – ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ: ১৩০, ১৩২

৮৮. পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৮

৮৯. পূর্বোক্ত

৯০. পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৩

৯১. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩,

৯২. পূর্বোক্ত, পৃ: ৯৭

৯৩. পূর্বোক্ত, পৃ: ২১৪

৯৪. বাল্মীকি শ্রীমস্মহর্ষি, রামায়ণমঃ (অযোধ্যাকাণ্ড), ৪৫ সর্গ, শ্লোক – ২২, সম্পা. – শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরী, কলকাতা, মে – ২০১২, পৃঃ ২৫১

৯৫. Havell, E.B., A Handbook of Indian Art, London, 1920, Forgotton Books, P. 5

৯৬. তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পাদিত), দেবী পুরাণম্, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা , পুনর্মুদ্রণ- ১৪১৬, পৃ: ১৭৩

৯৭. বেদান্ততীর্থ, গিরীশচন্দ্র, প্রাচীন শিল্প পরিচয়, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ – ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ: ১৪৪

৯৮. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৪৬

৯৯. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ১২৩

১০০. চক্রবর্তী, রামেশ্বর, শিবায়ন, রামেশ্বর রচনাবলী, সম্পা. – পঞ্চানন চক্রবর্তী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ২০১৩, পৃ: ৩৮৬

১০১. পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৯৭

১০২. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ৮৭

১০৩. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৫২

১০৪. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৬৯, ১৭০

১০৫. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৭২

১০৬. ব্যাসদেব, মহাভারতম্: সভাপর্ব্ব (৫), সম্পা. – শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ: ৪৫৩

১০৭. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ১৯১

১০৮. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৭৯

১০৯. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৭১

১১০. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৯৬

১১১. বেদান্ততীর্থ, গিরীশচন্দ্র, প্রাচীন শিল্প পরিচয়, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ – ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ: ১৪৪

১১২. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৪৬

১১৩. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ২২

১১৪. পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৫

১১৫. পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৭

১১৬. পূর্বোক্ত, পৃ: ৭১

১১৭. পূর্বোক্ত, পৃ: ৭২

১১৮. পূর্বোক্ত, পৃ: ১১৮

১১৯. চট্টোপাধ্যায়, কেদারনাথ, দারুশিল্প, প্রবাসী (পত্রিকা), তৃতীয় সংখ্যা, আষাঢ় – ১৩৩৪, সম্পা. – রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, পৃ: ৪২৯

১২০. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ১৩০

১২১. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ, প্রাচীন বাংলার গৌরব, জিসান হাবিব, (সম্পা.) পত্রলেখা, প্রথম পত্রলেখা প্রকাশ, (এপ্রিল ২০১৭), পৃ: ৭৬, ৭৭

১২২. বেদান্ততীর্থ, গিরীশচন্দ্র, প্রাচীন শিল্প পরিচয়, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ – ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ: ১০৭

১২৩. ঘোষ, ড. প্রদ্যোত, বাংলার লোকশিল্প, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ডিসেম্বর – ২০০৪, পৃ: ৭৬

১২৪. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ২

১২৫. পূর্বোক্ত, পৃ: ৮০

১২৬. পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৫

১২৭. পূর্বোক্ত, পৃ: ১০৪

১২৮. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৮৩

১২৯. গুপ্ত, অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ, একখানা প্রাচীন পুথিঁর মলাটচিত্র, প্রবাসী, ২৮ শ ভাগ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৩৫, পৃ: ৩৬৫, সম্পা. – রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

১৩০. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ১৭০

১৩১. পূর্বোক্ত

১৩২. পূর্বোক্ত

১৩৩. পূর্বোক্ত

১৩৪. ব্যাসদেব, মহাভারতমঃ সভাপর্ব্ব (৫), সম্পা. – শ্রীমদ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ: ৪৬৫

১৩৫. ঋগ্বেদ সংহিতা (মূল), ১০ মণ্ডল, ৩৪ সূক্ত, ।।১||, রমেশচন্দ্র দত্ত সংকলিত ও অনূদিত, নিমাইচন্দ্র পাল (সম্পা.), সদেশ, কলকাতা, পৃ: ৬৫১

১৩৬. বেদান্ততীর্থ, গিরীশচন্দ্র, প্রাচীন শিল্প পরিচয়, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ – ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ: ১৪১

১৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৪২

১৩৮. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ২৮

১৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ: ১১

১৪০. পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৩

১৪১. পূর্বোক্ত, পৃ: ১২১

১৪২. পূর্বোক্ত, পৃ: ১২৩

১৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৬৯

১৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৯৭

১৪৫. ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ, শুভ উৎসব, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, সম্পা.– ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ১৪২২, পৃঃ ৪১৯, ৪২০

১৪৬. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ৬৭

১৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৫৩

১৪৮. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, বাংলার ব্রত, ফাল্গুন ১৪১৮, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ: ৫

১৪৯. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ৫৭

১৫০. পূর্বোক্ত, পৃ: ৮০

১৫১. পূর্বোক্ত, পৃ: ২

১৫২. ব্যাসদেব, মহাভারতমঃ সভাপর্ব্ব (৫), সম্পা. – শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ: ৪০২

১৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ: ৪০৩

১৫৪. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ৬৪

১৫৫. সেন, দীনেশচন্দ্র, বৃহৎবঙ্গ (প্রথম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৪১২, মার্চ – ২০০৬, পৃ: ৫৬৬

১৫৬. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ৮৫

১৫৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, ও চৌধুরী, বিশ্বপতি সম্পা., কবিকঙ্কণ –চণ্ডী (প্রথম ভাগ), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২, পৃ: ৩৭, ৩৮

১৫৮. বেদান্ততীর্থ, গিরীশচন্দ্র, প্রাচীন শিল্প পরিচয়, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ – ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ: ১৩৮

১৫৯. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ২৯০

১৬০. পূর্বোক্ত, পৃ: ৭৬

১৬১. চক্রবর্তী, শ্রীস্বদেশরঞ্জন, প্রাচীন বাঙ্গালার ভাস্কর্য বিজ্ঞান ও তক্ষণ শিল্প, বঙ্গশ্রী (পত্রিকা), ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৭, পৃ: ৩৭২, ৩৭৪, সম্পা. – সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য

১৬২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ, খোদাই চিত্রে বাঙালি, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ১৩৪৬, সম্পা. - ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১৫১

১৬৩. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ১৭৫

১৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৫৩

১৬৫. পূর্বোক্ত, পৃ: ৭৯

১৬৬. পূর্বোক্ত, পৃ: ৮২

১৬৭. পূর্বোক্ত, পৃ: ১২১

১৬৮. মজুমদার, কমলকুমার, বঙ্গীয় শিল্পধারা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, সংকলন ও সম্পা.

– দয়াময়ী মজুমদার ও সন্দীপন ভট্টাচার্য, দীপায়ন, কলকাতা, বৈশাখ – ১৪০৫, পৃ: ৪

১৬৯. বেদান্ততীর্থ, গিরীশচন্দ্র, প্রাচীন শিল্প পরিচয়, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ – ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ: ১৩১

১৭০. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ১৫৪

১৭১. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৫৫

১৭২. ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ, প্রাচ্য প্রসাধন কলা, বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী, সম্পা. – ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয়- সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, মাঘ – ১৪২২, পৃ: ৪১৬, ৪১৮

১৭৩. বেদান্ততীর্থ, গিরীশচন্দ্র, প্রাচীন শিল্প পরিচয়, (ভৃঙ্গার), সুবর্ণরেখা, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ – ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ: ১২৮, ১২৯

১৭৪. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ১৫৬

১৭৫. পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৭

১৭৬. চট্টোপাধ্যায়, কেদারনাথ, দারুশিল্প, প্রবাসী (পত্রিকা), তৃতীয় সংখ্যা, আষাঢ় – ১৩৩৪, সম্পা. – রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, পৃ: ৪২৭, ৪২৯

১৭৭. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ৭৮